৭০ তম বর্ষ　　একাদশ সংখ্যা　　দান—পাঁচ টাকা
ফাল্গুন ১৪১৫

"ব্রহ্মচর্য্য সত্যনিষ্ঠা আছয়ে যাহার
সাধনার প্রয়োজন নাহিক তাহার।"

[সত্যের অনুশীলনার্থে শ্রীতারামঠ হইতে প্রকাশিত সত্যসঙ্ঘের মুখপত্র]

সম্পাদক :
সঙ্ঘপ্রাণ শ্রীমৈত্রেয় প্রতিম বড়ুয়া

সুচীপত্র

সৎসাহ্য

"সত্যমন্ত্র হে মানব কর রে গ্রহণ, সত্যই মঙ্গলপ্রসূ শান্তির কারণ।"

সপ্ততিতম বর্ষ ফাল্গুন ১৪১৫ একাদশ সংখ্যা

সন্তোষ

শ্রীতারাচরণ

সন্তোষ পাইব আমি সাধনার পারে,
ভয় দুঃখ দূর হবে দেবতার বরে।
দীনভাবে কাটাইব ক্রন্দনের রোলে,
মনোভাব জানাব মা তোমারই কোলে।
শৈলসিন্ধু মাঝে আমি মনের সঙ্গীত,
কতভাবে গাহিব যে তোমার চরিত।
দেহমন বিকাইব চরণ কমলে,
আত্মবলি দিয়ে মাগো শত পুষ্পদলে।
সহস্রার মাঝে আছ শিরের উপর,
অশ্রুনীরে ভিজাইব তোমার অন্তর।
ডাহুকের কুহুডাক দিবারাত্রি বয়,
রোদনের ধ্বনি কভু চরণে পৌঁছায়।
গাথাগুচ্ছ দিয়া আমি সন্দর্ভ লিখিব,
মনোমত ভাব তথা প্রকাশ করিব।
বহুদূর হতে আমি নয়নের বারি,
বহিয়া আনিব মাগো দিবস শর্ব্বরী।
সরল ভাবেতে আমি বলিব তোমারে,
এই আকিঞ্চন মাগো তব দয়া তরে।

জীবন সন্ধান

ডঃ লোকরঞ্জন গুহ

হিমালয়ের সুউচ্চতায় ক্রমবিবর্তিত পলিস্তর থেকে রূপান্তরিত যে কঠিন শিলাস্তর, বর্তমান নেপালের মুক্তি-নাথ অঞ্চলে পবিত্র গণ্ডকী নদীখাতে যা আজও প্রবাহিত, তার থেকেই শালগ্রাম-শিলা বা পবিত্র নারায়ণ শিলার উৎপত্তি। জীবন সন্ধানের উৎস হিসাবে যা আধুনিক জগতেও সুবিবেচিত। তম্মধ্যে কিছু বিশেষ বিশেষ প্রকারের শিলা কেবল পূজ্য ও বাকীরা ত্যাজ্য তাই তারা প্রাণের উৎস সন্ধানে ব্যর্থ মহাকাশ বিজ্ঞানানুসন্ধানে বৃহস্পতির দু'টো উপগ্রহে (গ্যানিমিড ও ইউরোপা) কার্বন-অণু-বিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব ঐ প্রাণের সন্ধান উৎস বিকল্পরূপেও দেখা দিয়েছে। এছাড়া, এই সৌরজগতের ত্রিসীমানার মধ্যে, একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্যত্র কোনও প্রাণের সন্ধান এমনকি কোনরকম সম্ভাবনাও এ যাবৎ দেখা যায়নি।

বহুযুগ ধরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে এসেছিলেন যে, সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলো মূলতঃ দুধরণের —জড় বা অজৈব এবং অজড় বা জৈব পদার্থ সমূহ। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর পদার্থগুলো, তাপের প্রভাবে চট্ করে পুর্বাবস্থা থেকে চিরদিনের মত পরিবর্তিত হয়না যেমনটা ঘটে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ জৈব-পদার্থের বেলায়। এই জৈব পদার্থের মূল, উপাদান হচ্ছে প্রাণশক্তি বা vitalism, যেখানে অজৈব সকল পদার্থের মূলশক্তি পারমাণবিক জড়শক্তি Nuclear Energy. তাই বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক ধারণা ছিল, ঐ প্রথম শ্রেণীর জড়পদার্থকে কোনদিনই দ্বিতীয় শ্রেণীর জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বার্জেলিসের (Bergelice) এই বদ্ধ ধারণা বদলে দিল তারই সুযোগ্য সুইডিশ ছাত্র উলার (Uler) সাহেব। ১৮২৮ সালে তিনিই প্রথম অজৈব থেকে যে জৈব পদার্থ তৈরী করতে সমর্থ হলেন, তিনি তার নাম দিলেন ইউরিয়া, যা কিনা কেবল প্রাণীদেহের কিডনিতেই তৈরী হওয়া সম্ভব বলে এতদিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল। ফলে প্রাণশক্তির সংজ্ঞাটা সংশোধন করে বলা হল—জীবদেহে জৈব পদার্থ এক আবশ্যিক উপাদান বিশেষ, আর শুধুমাত্র অজৈব পদার্থ দিয়ে কোন জীবদেহ গঠিত হতে পারে না। এছাড়া জৈব পদার্থে আবশ্যিক ভাবেই থাকতে হবে চতুর্ভুজ কার্বন অণু ও অন্যান্য অজৈব মৌলের পরমাণু।

শালগ্রাম শিলান্বেষণে লেখক অলোক রায়, জীবনের উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন যেন অনেক ব্যাপারেই সহমত, অন্ততঃ সেই অভিমুখে যাত্রারত। সুপ্রসিদ্ধ ডারউইনের জীব-বিবর্তনের পূর্বযুগে একটা অজৈব-বিবর্তন যুগেরও পর্য্যায় সংঘটিত হয়েছিল। যার ফলে, জীবনের সম্ভাবনাময় কিছু যৌগিক আদি পদার্থ সৃষ্টি হয় আদিম সমুদ্রের জলে, ভাসমান অবস্থায়। একেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় "গরম হালকা সুপ" বা Primordial Soup বা বিশ্বকবির ভাষায় প্রাণপঙ্ক আর হিন্দু শাস্ত্রের বর্ণনায় ক্ষীরসমুদ্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর ঐ ক্ষীর সাগর মন্থন করেই ভগবান নারায়ণ (বিষ্ণু) সৃষ্টি করেছিলেন তাবৎ জীব জগৎ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী মিলার, অ্যাবেলমন ও মেলভিন কেলভিনদের আবিষ্কার তথা পৃথিবীর আদিম পরিমণ্ডল তত্ত্বানুসন্ধান জানা গেছে যে, তদৈব বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মহাজাগতিক

অতি বেগুনী রশ্মি (Ultraviolet ray) কর্তৃক (Amino Acid) অ্যামাইনো অ্যাসিড সৃষ্টির কথা। যেখানে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডই-হল গিয়ে জীবদেহ বা জীবন সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস উপাদান। তাই বর্তমান পৃথিবীর মহাকাশে, যে ওজোন ছাতা (Ozone Layer) বিদ্যমান তা কার্য্যক্ষেত্রে মর্ত্যের জীবকুলকে ঐ মহাজাগতিক রশ্মির প্রকোপ থেকে রক্ষা করছে যদিও তা আদিতে ছিল প্রথম জীবন সৃষ্টির এক আদি পদক্ষেপে আদিম জৈব পদার্থ অ্যামাইনো অ্যাসিড গঠনের মূল কারক।

আদি সৃষ্টি পর্বের ঠিক ঠিক পরবর্তীকালে ঐ সৃষ্ট যৌগিক পদার্থগুলো আদিম সমুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গে ভেসে গিয়েছিল সমুদ্রের গভীরে তাই ঐ মহাতেজস্ক্রিয় রশ্মির নাগালের আরও বাইরে। সিংহলী বিজ্ঞানী পুন্নপের-মারের মতে, তখন ঐ আদি জগতের যৌগিক পদার্থে সমুদ্রের এক-শতাংশ পরিপূর্ণ হয়েছিল। ঐ বিপুল প্রাণপঙ্ক, কোটি কোটি বছর পরে স্বাভাবিক সৌরশক্তির সাহায্যে নানারকম সমন্বয়-বিন্যাস প্রক্রিয়ার ফলে, রূপান্তরিত হল প্রাণ-সম্ভাবনায়-সম্ভাবনাময় প্রাণপঙ্কজে। এবার এই অজৈব বিবর্তনের পরিণতিতে সৃষ্টি হল একে একে জটিলতর অণু. শুরু হয়ে গেল পরবর্তী পর্যায়ে জৈব বিবর্তন। গঠিত হল অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিনয়েড (Protenoid) ডি,এন,এ (D.N.A.) অণুর নিউক্লিইক অ্যাসিড (Nucleic Acid)। ঐ জটিল যৌগগুলো বৃহৎ-অণু শৃঙ্খল গঠন করে মূলবিন্দুর (Droplets)- আকার নিল। কালে, আকারে তারা আরও বড় হয়ে উঠল—তারপর হঠাৎ একদিন বিভাজিত হল একাধিক অণুরূপ "ফোঁটায়" (similar droplets-এ)। তবে জীব নয়, জীবনও নয়, এরা কেবলই জীবনের সম্ভাবনা স্বরূপ পদধ্বনিমাত্র অস্তিত্ব বিশেষ। এরও অনেক পরে এল—ইওব্যাকটেরিয়াম (Iobacterium) বা আদিম ব্যাকটেরিয়ার দল। তারা আবহমণ্ডলে জমে থাকা জৈব যৌগের সাহায্যে এক অভিনব উপায়ে সূর্য্যরশ্মিকে ব্যবহার করে জীবনচক্র চালিয়ে যেত বলেই বৈজ্ঞানিকদের অনুমান। তারপর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে সমুদ্রের তলায় তারা ছড়িয়ে পড়ল নীল-সবুজ Algae বা শ্যাওলার রূপে। শুরু হয়ে গেল সালোক-সংশ্লেষ (photosynthesis) প্রক্রিয়া, যার অবধারিত ফসল আদিম আকাশে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে বিরাজিত মুক্ত অক্সিজেনের বিকাশ। এবার অক্সিজেন বিপ্লব ধারাতে সৃষ্টি হতে লাগল একের পর এক উন্নত শ্রেণীর জীব-জীবন তথা বহুকোষী মেটাজোয়া (Metazoa) গোষ্ঠী, উদ্ভিদ, স্থলচর প্রাণী, মানুষ প্রভৃতি।

জীবন-বিবর্তন নাটকের প্রায় শেষ পর্য্যায়ে আবির্ভূত মানবগোষ্ঠী তথা মানব-জীবন। যার কৃত্রিম কারিগরী সভ্যতা যা কিন্তু প্রকারান্তরে ঐ প্রাণদায়ী, উন্নত জীব সৃষ্টিকারী প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রারই হ্রাসকারক তারই এক বিপরীত মুখী আত্মঘাতী ধারা। যেন এবার তাই উল্টো পথের উল্টো রথযাত্রা। যে প্রাণদায়ী অক্সিজেন গ্যাসে মুক্ত বাতাসে বা যৌগ জলে উপস্থিত হয়ে উন্নত জীবকুল তথা মানবগোষ্ঠীর গঠনকারী, তারই এ যেন এক আসন্ন অবশ্যম্ভাবী অকালমৃত্যু, তাও আবার তার উৎপাদিত শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান কর্ত্তৃক। এ বিপদ সঙ্কেত আধুনিক বিজ্ঞানীকুল দ্বারা বারংবার

প্রতিধ্বনিত। তা সত্ত্বেও বর্তমান পৃথিবীর আবহ-মণ্ডল যথেষ্টই দূষিত এবং সেই দূষণ অযাচিত হলেও ক্রমবর্ধিত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাই বর্তমান বায়ুমণ্ডলে পরিলক্ষিত হয় কার্বন-মনোঅক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইডের ক্রমবর্ধমান দূষণমাত্রা এবং ঐ দূষণজাত পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে **Global warming, Green house effect** প্রভৃতি প্রাণ-পরিবেশ বিধ্বংসী কুলক্ষণ সমূহ আজ সর্বজন নিশ্চিত। তাই এই উল্টোপথে পুনরায় পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ওজোন ছাতাকে ছিদ্র করে, পুনরায় মহাজাগতিক অতি বেগুনী রশ্মির পুনরাগমন ও যেন আগামী অদূর ভবিষ্য.ত সুনিশ্চিত।

প্রাণ সভ্যতার এই সর্বাপেক্ষা সঙ্কটকালেও কিন্তু ভারতীয়রা সুপ্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের দর্শনই একমাত্র দিক্-দিশারী, পথ নির্দেশকারী। যেখানে এই সংকটকালও যেন এক অবশ্যম্ভাবী চিত্র। এমনকি উন্নত বিজ্ঞান মনস্ক পাশ্চাত্যবাসীর প্রতিও তাই বৈদান্তিক স্বামীজীর এই নিষেধ বাক্য বারংবার প্রতিধ্বনিত, সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত। তাহলে এবার পরে থাকল একটি সত্যিকারের মূল্যবান প্রশ্ন। তাহলে কি আমরা জৈব-বিবর্তের শিখরে আরোহণ করে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে বিপথগামী, বিপরীতমুখী। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের এক গভীর বিশ্লেষণ করলে হয়ত দেখা যাবে সেখানে গ্রথিত রয়েছে এক সুপ্ত গুপ্ত আশার আলোক। এবং সেই আশার বাণী কিন্তু অনেকটাই সর্বাধুনিক ঋষি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনে সমাহিত। বিশেষতঃ তার রূপান্তর-যোগ দর্শনের অব্যক্ত কারণ স্বরূপে। সেই যোগ-দর্শনে এক পরবর্তী উন্নত অবস্থায় তথা মানবগোষ্ঠীর এক নূতন ধাপে উত্তরণের কথা ঘোষিত হয়েছে। তাই সিদ্ধান্তে বলা যেতে পারে, যে এযাবৎ শ্রেষ্ঠ জীব মানবই যেমন প্রাণ-সভ্যতা তথা দৈব বিবর্তনের আপাতঃ ধ্বংসকারী কিন্তু তা কেবল ঋণাত্মক পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বরং তাতে রয়েছে বিধাতার অতি সুকৌশল জাত এক ধণাত্মক গুপ্ত ক্রিয়া, যাতে পুরোন সৃষ্টির ধ্বংসের সাথে সাথেই এক নূতন উচ্চতর পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টির বীজ গুপ্ত, সুপ্ত ভাবে বর্ণিত। ফলে শ্রেষ্ঠ মানব জীবের আগামী উত্তরণ পর্ব এক অতি মানস প্রজন্মভীত, এক নূতন প্রাণের বিবর্তনে।

গীতা

অনিল চন্দ্র দত্ত (প্রয়াত)

গীতা শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। জার্মান মনীষী উইলিয়াম জন্ হামবোল্ট বলেছেন—"গীতার মত সুললিত, সত্য ও সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই।" মহামান্য তিলক বলেছেন—"গীতার মত অপূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"উপনিষদ্ থেকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করে' গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হয়েছে।" মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—"গীতা মানবের পারমার্থিক জননী।" মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সুরী তাঁহার গীতা ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখেছেন—"ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চো কৃৎস্নশঃ গীতায়ামস্তি তেনেরং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥"

উক্ত শ্লোকের মর্মার্থ এই যে মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত। আর সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায় বর্তমান। সেইজন্য গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত। কেশব কাশ্মীরী বলেছেন—"শ্রীভগবান্ করুণাপূর্বক ভবসাগর পার হ'বার জন্য গীতারূপ নৌকা সৃষ্টি করেছেন। মোগল সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারাশিকো লিখেছেন—"গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস"। মনীষী এল্ ভি বার্ণেট বলেছেন—"লক্ষ লক্ষ লোক গীতা পড়েছেন বা শুনেছেন। সকলেই গীতার পাঠে ও শ্রবণে বুঝতে পারেন যে ঈশ্বরলাভের দুর্গম পথে গীতা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সহচর।

শ্রীঅরবিন্দ পুরুষোত্তমবাদী। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে পুরুষোত্তম যোগ বর্ণিত, তিনি তাহাই অবলম্বনপূর্বক স্বীয় দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই জীব ও জগৎ ক্ষর পুরুষ। কূটস্থা প্রকৃতি অক্ষর পুরুষ এবং উভয় পুরুষের অতীত যে ঈশ্বর. তিনি উত্তম পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—কয়েকবার "গীতা" "গীতা" উচ্চারণ করলে যাহা হয়, তাহাই গীতার শিক্ষা—অর্থাৎ ত্যাগই গীতার বাণী। ত্যজ্ ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা। সকল কর্ম্মের ফলাকাঙ্খা ত্যাগই গীতার বাণী।

"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্ব মানশু"—একমাত্র ত্যাগের দ্বারা অনেকে অমৃতত্ব লাভ করেছেন। উপনিষদের এই মহতী বাণীই গীতায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত।

গীতা একটি উপনিষদ্। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বেদব্যাস গীতাকে উপনিষদ্ বলেছেন। উপনিষদ তত্ত্বই গীতায় নিহিত আছে। গীতা ধ্যানে আছে—"উপনিষদরূপ গাভী সমূহের দুগ্ধই এই গীতামৃত"।

গীতায় ও ভাগবতে একই তত্ত্ব উপদিষ্ট। উভয় গ্রন্থেই সমানভাবে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। গীতা থেকে জানা যায় যে জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, রাজযোগ এবং কর্ম্মযোগের প্রত্যেকটিই অন্য নিরপেক্ষ মোক্ষমার্গ। গীতায় এই সমন্বয় অপূর্ব এবং সনাতন ধর্ম্মের গৌরব।

তথ্যসূত্র:—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কতৃক অনুদিত এবং স্বামী জগদানন্দ কতৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা

॥ হিন্দী থেকে অনুবাদ ॥

॥ জন্মান্তর ॥

মূল হিন্দী লেখক—আদর্শ কুমার খরে
বাংলা অনুবাদ—শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

[হিন্দী দৈনিক পত্রিকা 'সন্মার্গ'; কোলকাতা, রবিবার, ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৪ সাল।]

মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ধারণা এক নয়। প্রাচ্য দেশগুলি ভাবে যে, মৃত ব্যক্তি তার শরীর ত্যাগ করেছে; আর পাশ্চাত্য চিন্তা অনুসারে—সে তার আত্মা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভিতর এই চিন্তাগত পার্থক্যের কারণ হলো কি, পাশ্চাত্য ভাবে ব্যক্তি হচ্ছে 'শরীর'। আর প্রাচ্য মনে করে ব্যক্তি তার আত্মারই অপর নাম; এই আত্মা জরাব্যাধি-মৃত্যুহীন। মানুষ যেমন পোশাক বদল করে—সেই রকম—আত্মাও তার পুরনো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে থাকে।

পৃথিবীতে প্রাণী-অপ্রাণী সকলের ক্ষেত্রেই জন্ম-মৃত্যু একটি চির অন্ধকারময়, চির রহস্যময় ঘটনা। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে ভারতবাসী পৌরাণিক চরিত্র নচিকেতাকে স্মরণ করবেই। নচিকেতা ছিল এক ঋষিপুত্র। তার প্রতাপশালী পিতা একবার বিশ্বজিত যজ্ঞ করার পর উপস্থিত ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধ, অসুস্থ গাভী দান করছিলেন। সেই সময় নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কি, তিনি তাকে কার কাছে দান হিসেবে সমর্পণ করেছেন। ব্যস্ত পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন যে, তিনি তাকে দান করেছেন যমরাজের হাতে।—পিতার এই কথা যজ্ঞের সময় বলা হয়েছিল বলে নচিকেতাকে যমরাজের কাছে যেতেই হলো। নচিকেতা যমপুরীতে গিয়ে দেখে কি, যমরাজ বাড়ীতে নেই। তাঁর দেখা পাবার জন্য নচিকেতাকে যমপুরীর বাইরে তিনদিন তিন-রাত অপেক্ষা করতে হলো। তারপর যমরাজ ফিরে এলেন। তিনি নচিকেতার নম্রতা আর ধৈর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যমরাজ মৃত্যু দেবতা বটে, কিন্তু তাঁর মনে স্নেহের কোন অভাব ছিল না। তিনি পুত্রসম নচিকেতাকে তিনটি বর পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাইলেন। নচিকেতা প্রথম বর এই চাইল যে, তার গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর তার পিতা যেন খুশী মনে তাকে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা স্বর্গের দেবদেবীদের বার্ধক্যহীনতা এবং মৃত্যুহীনতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে চাইল। —তখন যমরাজ নচিকেতাকে 'অগ্নিজ্ঞান' দিলেন। পরবর্তী কালে এই অগ্নিজ্ঞান 'নাচিকেতাগ্নি' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মা এবং জন্মমৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল। যমরাজ নচিকেতার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি। তিনি তাকে ঐ প্রশ্নের উত্তরের বদলে প্রভূত ধন-সম্পদ-রাজ্য ইত্যাদি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নচিকেতা রাজী হলো না; সে ঐ উত্তরটাই চাইল। তখন যমরাজ নচিকেতাকে 'আত্মজ্ঞান' দিলেন। পরবর্তীকালে জ্ঞানী নচিকেতা তার সেই আত্মজ্ঞান পৃথিবীর অন্য মানুষদের দেবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হয়নি; তা তাদের কাছে আগের মতই চির রহস্যময়, চির দুর্বোধ্য রয়ে গেছে।

পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষ আত্মার নতুন দেহে প্রবেশ—অর্থাৎ তার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে; আর এক শ্রেণীর মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। প্রাচ্য দেশ ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আদি যেসব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল—সেই সব ধর্মের মানুষ আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। এরা একথাও ভাবে যে, কোন কোন মানুষের ভিতরে তার গত জন্মের ঘটনা স্মরণ করার শক্তি থাকে। এরা এই ধরনের মানুষের নাম দিয়েছে 'জাতিস্মর'। বলা হয়ে থাকে যে, বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করার আগেই নিজের অসংখ্য অতীত জন্মের ঘটনা স্মরণ করতে পারতেন। 'বুদ্ধজাতক কথা' গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী জন্মগুলির অজস্র ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

তবে একথাও ঠিক যে, কেবল হিন্দু বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের মানুষের ভিতরে নয়—পৃথিবীর যেসব ধর্মের মানুষ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না—তাদের ভিতরেও জাতিস্মরের সন্ধান পাওয়া গেছে। আবার পৃথিবীতে কিছু কিছু এমন মানুষও আছে যাদের বংশপরম্পরা গত ধর্মে পুনর্জন্ম-ব্যাপারে অনাস্থা আছে—অথচ তারা ব্যক্তিগতভাবে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।

যেমন বলা যায়—ইংলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত যুবরাণী ডায়ানার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি পূর্ববর্তী জন্মে নার্স ছিলেন এবং সেই কারণেই এই জন্মে সেবাকার্য্যে তাঁর এত অনুরাগ।

এ্যানি বেসান্তও বিশ্বাস করতেন যে, "পূর্বজন্ম' বলে একটা ব্যাপার আছে।

একবার চীন দেশের এক সংবাদ পত্রে একটা খবর পরিবেশন করা হয়েছিল। সেটা হলো এই যে, ট্যাংগ বংশের রাজত্বকালে ট্যাংগ শাও নামে একজন শিক্ষা এথা উৎসব বিভাগীয় উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। যে সরকারী ভবনে ঐ বিভাগগুলি ছিল—তার এক নিরাপত্তা কর্মীর নাম ছিল লী মিয়াও। ট্যাংগ শাও প্রায়ই লী মিয়াও কে নিজের খাবার টেবিলে ডেকে নিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, গল্প গুজব করতেন। এইভাবে দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলেন। কিন্তু এই অমন বন্ধুত্বের কারণটা কেউ বুঝতে পারতো না এবং সেইজন্য ট্যাংগ শাও এর পত্নীও খুব মানসিক অশান্তি ভোগ করতেন। লী মিয়াও নিজেও একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেত কি কেন এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। তার মত একজন নীচু স্তরের কর্ম্মচারীর সঙ্গে ট্যাংগ-এর মত এক উচ্চ পদস্থ অফিসার কি কারণে এত মেলামেশা করতে চান—তা সে কিছুতেই বুঝতে পারতো না।—এইভাবে বেশ কিছুদিন চলে যাবার পর একদিন একটি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। চীন দেশের সেই সময়কার সম্রাট জুয়ান জোংগ কোন কারণে ট্যাংগ শাও-এর উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্য্যকর হওয়ার পূর্ব্বদিন ট্যাংগ শাও তাঁর স্ত্রীকে বললেন যে, তিনি একজন জাতিস্মর। পূর্ব্বজন্মে তিনি একজন মহিলা ছিলেন। তিনি সেই সময়ে ব্যাংগ পরিবারের বধূ ছিলেন। ঐ পরিবারটি বার্লিন নামক স্থানে বাস করত। যখন ঐ মেয়েটি সতেরো বছরের ছিল—সেই সময়ে তার শাশুড়ী পঁচিশে ডিসেম্বরের উৎসব উপলক্ষ্যে তাকে খাবার তৈরী করতে বলল। রান্নাগুলি করতে করতে মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রান্না হয়ে যাবার পর মেয়েটির শাশুড়ী তাকে একটা স্কার্ট তক্ষুনি

সেলাই করে ফেলতে বলল—কারণ পরের দিন বাড়ীতে অতিথিদের সামনে তাকে ঐ স্কার্ট'টা পরতে হবে। সেইমত রাতে লণ্ঠনের আলোয় সে যখন ঐ স্কার্ট'টা সেলাই করছিল—তখন একটা কুকুর এসে জ্বলন্ত লণ্ঠনটাকে ঐ স্কার্টের উপরে উলটে দিল। স্কার্ট'টা আগুনে পুড়ে গেল। আগুন দেখে কুকুরটা ভয় পেয়ে গিয়ে বিছানার তলায় লুকিয়ে পড়ল। নিজের স্কার্ট'টা ঐভাবে পুড়ে নষ্ট হয়ে যেতে দেখে মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তার খুব রাগও হলো। সে একটা কাঁচি দিয়ে কুকুরের ঘাড়টা কেটে ফেলার চেষ্টা করল; কিন্তু একটু কাটার পরই কাঁচিটা ভেঙে গেল। তখন দ্বিতীয় একটা কাঁচি দিয়ে মেয়েটি কুকুরটার গলা পুরোপুরি কেটে ফেলল। —এই ঘটনার দু বছর বাদে—যখন মেয়েটির বয়স উনিশ বছর—তখন সে নিজেই মারা গেল। মরণের পরে ঐ মেয়েটি একটি পুরুষ হয়ে আবার জন্ম নিল; এখন তার নাম হলো ট্যাংগ শাও। আর ঐ মৃত কুকুরটি তার পরবর্তী জন্মে লী মিয়াও নামে একটি মানুষ হয়ে মনুষ্য সমাজে বিচরণ করতে লাগল।

ট্যাংগ শাও যেদিন তাঁর স্ত্রীকে নিজের এই পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত বললেন—তার পরের দিনই স্বেচ্ছাচারী চীন সম্রাট জয়ান জোংগ ট্যাংগকে হত্যার ভার দিলেন তারই অন্তরঙ্গ বন্ধু লী মিয়াও-এর উপর। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, প্রথম বার যখন লী মিয়াও ট্যাংগ শাও কে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল—তখন তা ভেঙ্গে গেল। দ্বিতীয় একটি তলোয়ার নিতে হলো এবং তাই দিয়ে আঘাত করে লী ট্যাংগকে মেরে ফেলল। বিনা প্রতিবাদে ট্যাংগকে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে ঐ খামখেয়ালী স্বভাবের সম্রাটেরও দুঃখ হলো; তবে তিনি স্বভাবতই কুচক্রী ছিলেন বলে—ঐ হত্যার দায়টা নিরপরাধ লী মিয়াও এর উপরই চাপিয়ে দিলেন। তিনি রাজসভায় ঘোষণা করলেন যে, লী-এর বারংবার প্ররোচনাই তাঁকে বাধ্য করেছিল ট্যাংগকে মৃত্যুদণ্ড দিতে। এবং এই কারণে লী মিয়াও কে সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হলো।

ট্যাংগ যদি তাঁর পূর্ব্বজন্মের কথা না বলতেন তাহলে এই কর্মফলের ব্যাপারটা বোঝা যেতো না। মানব সমাজের অতি পুরাতন ইতিহাসে এই ধরণের জাতিস্মরের সংখ্যা অতি নগন্য। তাই জন্মান্তর আর কর্ম্মফলের ব্যাপারটা প্রায় সব সময়েই গভীর রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা হয়ে আছে। মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, সাধনা - সব কিছুই এক্ষেত্রে চির পরাজিত। মানুষ যেমন ভগবানকে জানতে পারে না, সেই রকম—মৃত্যুর ওপারে কি আছে—তাও কেউ জানতে পারেনি। প্রায়ই দেখা যায় যে, কেউ রূপবান অথচ নির্ধন। কেউ ধনবান অথচ রূপহীন কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত। কেউ আকস্মিক ভাবে মরে গেল, আর কেউ বা আশ্চর্য্য ভাবে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়ে বেঁচে রইল। এই সব ঘটনার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে অনু-ধাবন করতে না পেরে আমরা সাধারণ ভাবে কর্ম্মফল আর পূর্ব জন্মের কথা বলে মনে সান্ত্বনা খুঁজি।

কিছুদিন আগে ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রগুলিতে একটি অদ্ভূত খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তা এই যে, টিটু সিংহ নামে একটি আড়াই বছরের ছেলে

তার বর্তমান পরিবারের লোকেদের সর্বদা বলে কি, সে আগ্রা শহরের অধিবাসী; তার স্ত্রীর নাম উমা। সে দুটি শিশুর পিতা। সে একটি রেডিও - টিভি - ভিডিও দোকানের মালিক। একদিন রাতে সে গাড়ী চড়ে নিজের বাড়ীর সামনে পৌঁছেছিল। ঐ সময়ে কোন এক ব্যক্তি পিছন থেকে তার মাথায় গুলি করে তাকে হত্যা করে।

বাচ্চা ছেলেটি তার আগ্রার ঠিকানাও সঠিক ভাবে বলেছিল—যদিও ইতিপূর্বে তার সামনে আগ্রা শহরের নামও কেউ বলেনি। তার মুখে বারবার এই সব কথা শুনে তার বর্তমান পরিবারের লোকেরা তাকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রার ঐ ঠিকানায় গিয়েছিল। তারা অবাক হয়ে দেখেছিল যে, তার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। এমন কি ঐ আড়াই বছরের ছেলেটি সেখানে বহু লোকের ভিতরে ঠিক নিজের স্ত্রী উমাকে এবং নিজের শিশু সন্তান দুটিকে চিনতে পেরেছিল; তাদের সঙ্গে নিকটতম আত্মীয়ের ভঙ্গীতে কথাও বলেছিল।

ইংলণ্ডে সম্মোহন বিদ্যার সহায়তায় কিছু কিছু লোককে তাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করানো গেছে। একবার এক সম্মোহিত ব্যক্তি বলেছিল কি, তার পূর্ব জন্মের নাম ছিল জন র‍্যাফেল। সে একটা গ্রামে বাস করত। সে একবার যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। সেই সময়ে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। —এর পরের ঘটনা আর সে স্মরণ করতে পারে নি। —জাতিস্মর বিষয়ে গবেষকগণ ঐ ব্যক্তি যে গ্রামের নাম বলেছিল—তার অতীত রেকর্ড খুঁটে সেই ব্যক্তির জন্ম সংক্রান্ত কোন প্রমাণ পান নি; তবে জানা গেছে যে, জন র‍্যাফেল নামক এক ব্যক্তি সেনাবাহিনীতে অবশ্যই যোগদান করেছিল।

'ব্যাংকক পোষ্ট'-এ একবার একটা খবর ছাপা হয়েছিল। সেটা হলো এই যে, উড় নামে একটি মেয়ে তার বাল্য বয়সে নিজের পূর্ব জন্মের গল্প বোলত। উড়-এর পরিবারের লোকেরা এবং তার স্কুলের শিক্ষিকারা সেই সব গল্প শুনত। উড়-এর পূর্ব্ব জন্মের কথা শুনলে তার মা সইম অংগ মুংগ কের্‌ড খুব ভয় পেতেন। তিনি উড়কে এই বলে শাসাতেন যে, যদি সে এই ধরণের কথা বলা বন্ধ না করে—তাহলে তিনি তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবেন না। —এখন ঐ বালিকার বয়স প্রায় বাইশ বছর হয়ে গেছে এবং তার পূর্ব্বজন্মের কথা সে আর স্মরণ করতে পারে না।

ব্রাজিলের এক উকিল তথা পেশা - উপদেষ্টার নাম কার্লোস এ. এল. ডি কার্ব্বাল হো। তাঁর বক্তব্য হলো কি, তিনি যখন আয়নায় নিজের মুখ দেখেন তখন তাঁর মুখের আকৃতি বদলে যায়। এই সময়ে তিনি নিজের বিভিন্ন পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন। কার্লোস-এর বিবরণ অনুসারে, তিনি এক পূর্ব্বজন্মে মিশর দেশের পাদরী ছিলেন; অন্য এক অতীত জন্মে তিনি জোকার ছিলেন।

রুশ দেশের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা মহিলা ইন্না মাকারোয়া সাহিত্যে ডিগ্রী নিয়েছেন। তিনি এখন সেক্রেটারীর পদে কর্মরতা। তিনি বলেন যে, প্রখর স্মরণশক্তি থাকার ফলে ছোটবেলায় দেখা স্বপ্নের বিষয়বস্তুও তাঁর মনে আছে। যখন তিনি দু'বছরের বালিকা ছিলেন—সেই সময়ে

তিনি একটি বিশেষ স্বপ্ন প্রতি সপ্তাহে দেখেছিলেন। পুরো তিন বছর তিনি সেই স্বপ্নটা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই স্বপ্নটা হলো কি, ইন্না মাকারোয়া মেনউস যেন সৈনিকের পোশাক পরে আছেন এবং শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি যেন বন জঙ্গলের ভিতরে এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শত্রুরা তাঁকে ধরে ফেলেছিল এবং ছোরা দিয়ে তাঁর গলাটা কেটে দিয়েছিল তিনি আর বাঁচতে পারেন নি—পাঁচ বছর বয়সে তাঁর এই স্বপ্নটা দেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইন্না বড় হয়ে যাবার পর—আজ থেকে চার বছর আগে—দু' হজার সালে তার জার্ম্মানী যাবার সুযোগ মিলেছিল। জার্মানীতে ইন্না আয়ার কাজ নিয়েছিলেন। সে তো পরের কথা। তার আগে শোনা যাক কি হয়েছিল। ইন্না রেল গাড়ীতে চড়ে রাশিয়া থেকে জার্মানীতে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি জার্মানীর সীমা পার হলেন—তখন তাঁর মনে হতে লাগল কি জার্মানীর ঐ সব জায়গা তাঁর অতি পরিচিত; যদিও এর আগে তিনি কখনও জার্মানীতে আসেন নি। জার্মানীতে থাকার সময়ে প্রথম দুমাসে সেই বাল্যকালের স্বপ্নটি আরও বিস্তারিতভাবে ফিরে এসেছিল। পূর্ব জন্মের অস্পষ্ট স্মৃতিটি যেন আরও উজ্জল হলো। ইন্নার মনে হতে লাগল কি, তিনি পূর্বজন্মে পুরুষ ছিলেন এবং তখন তাঁর নাম ছিল সরাদোও। তিনি তখন বুলগেরিয়ায় থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ঐ সরাদোও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিষ্টরা জার্মানীর বনভূমির ভিতরে তাকে হত্যা করেছিল। জীবনের যে সময়ে ইন্না ঐ স্বপ্ন দেখছিলেন—তখন তাঁর কেবলই মনে হতো কি—তিনি বর্তমানে জার্মানীর যে পরিবারে আয়ার কাজ করছেন—সেই পরিবার আসলে তাঁর পূর্ব জন্মের শত্রুদের পরিবার। নিজের অনুভবে এটা আসার পর তিনি আর সেখানে কাজ করতে চাইলেন না, তিনি রাশিয়ায় ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। আশ্চর্য ঘটনা এই যে, যখন তিনি রাশিয়ায় যাবার জন্য ঐ বাড়ী ছেড়ে বেরোচ্ছেন—সেই সময়ে ঐ পরিবারের একজন মহিলা তাঁকে বুলগেরিয়ায় তৈরী অলংকার দিয়ে সজ্জিত একটি পোষাক উপহার দিল।

দক্ষিণ রাশিয়ার অনাপা নামক জনবসতিতে বৈলো নামে এক তেইশ বছরের মহিলা বাস করেন তাঁর কথা অনুসারে তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় কথা বলতে পারেন। এই ভাষাগুলির ভিতরে যোড়শ শতাব্দীর ইংরেজী, চীনী, ফারসী আদি ভাষার সঙ্গে ভিয়েতনামী, কোরিয়ান, মঙ্গোলীয়, মিশরী ভাষাও আছে। এই সমস্ত ভাষার অধিকাংশই তিনি নিজের পূর্ব জন্মগুলিতে শিখেছিলেন। প্রায় দশ বছর আগে একদিন যখন তিনি নিজের স্কুলে অংকের ক্লাসে বসেছিলেন—সেই সময়ে হঠাৎ তিনি নিজের রুশ ভাষা ভুলে গিয়ে এমন সব ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন যেগুলি তিনি জানতেনই না। ঐ সময়ে তিনি কি রকম একটা যেন আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মুখে ঐ সব অপরিচিত ভাষা শুনে ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষক আর অন্য ছাত্র - ছাত্রীরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল।

উনিশ শ উনত্রিশ - ত্রিশ সালে আমাদের এই ভারতবর্ষের দিল্লী শহরে শান্তি নামে একটি চার বছরের বালিকা ছিল। সে তার পরিবারের সবাইকে বলতো কি, সে আসলে এই পরিবারের লোক নয়—তার সত্যিকার পরিবার মথুরায় বাস করে। সেখানে তার স্বামী আর ছেলে থাকে। শান্তি দেবী তার মথুরার ঠিকানাও দিয়ে দিল। কৌতুহলী হয়ে শান্তিদেবীর স্কুলের একজন শিক্ষক ঐ ঠিকানায় একটি চিঠি দিলেন। কিছুদিন বাদে সেই চিঠির উত্তরও এসে গেল। তাতে লেখা ছিল কি, লুগদী দেবী নামে এক মহিলা ঐ বাড়ীতে কয়েক বছর আগে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবার পর মারা গিয়েছিল। —এর পর কয়েকজন সাংবাদিক এবং জন্মান্তর বিষয়ক গবেষক শান্তি দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় গিয়েছিলেন। ঐটুকু বাচ্চা মেয়ে অতি উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিজের পূর্ব জন্মের বাড়ীতে নিয়ে গেল। যেখানে সে গত জন্মের সব আত্মীয়কে চিনতে পেরেছিল। এই সময়ে সে নিজের পরিবারের এমন সব গোপন কথা বলতে থাকে —যেগুলি কেবল ঐ পরিবারের লোকেরাই জানতো —আর কেউ নয়।

ইংল্যাণ্ডবাসী এক মহিলার নাম নেওমী হেনরী। তিনি তাঁর দুটি পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন। একটি জন্ম হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। সেই সময়ে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের গ্রীহালম্ নামক এক গ্রামে বাস করতেন। —গবেষকগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, এই নামের একটি গ্রাম সপ্তদশ শতাব্দীর আয়ারল্যাণ্ডে ছিল। হেনরী বলেন যে, তাঁর স্মরণে আসা দ্বিতীয় পূর্ব জন্মটিতে তিনি একজন ইংরেজ নার্স ছিলেন। তিনি উনিশ'শ দুই সালে ডাউনহাম নামক একটি অঞ্চলে থাকতেন। —গবেষকগণ পুরোন সরকারী রেকর্ড ঘেঁটে দেখেছেন যে, এই রকম একজন নার্স - মহিলা ঐ গ্রামে উনিশ শ দু' সালে সত্যিই ছিলেন এবং এইসব তথ্য আগেভাগে সংগ্রহ করার কোন উপায় ঐ নেওমী হেনরী নামক মহিলার ছিল না।

ভারতবর্ষে শারদা বাজপেয়ী নামে একটী তিন বছরের বালিকা অষ্টাধ্যায়ী-গ্রন্থের চার হাজার সংস্কৃত শ্লোক সহজেই বলতে পেরেছিল ; যদিও সে সংস্কৃত গ্রন্থ পড়তে জানতো না।

থাইল্যাণ্ডেও কতকগুলি পুনর্জন্মের ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়

ভারতবর্ষে যে সব পণ্ডিত পুনর্জন্ম নিয়ে গবেষণা করেন—তাঁরা এই ধরণের শত শত ঘটনার কথা জানতে পেরেছেন। পুনর্জন্ম-স্মরণকারী জাতিস্মররা আত্মা সংক্রান্ত গবেষণার জগতে সর্বদাই স্বাগত; এরাই মৃত্যু সমুদ্রের এপারে - ওপারে অবস্থিত যে দুটি জীবন—তাদের ভিতর সংযোগ স্থাপনকারী এক অদ্ভুত সেতু। তবে এই সেতুও বড়ই ক্ষণস্থায়ী কেননা তারা শিশু বয়সে নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মের রীতিপ্রকৃতি-অভ্যাস অনুসারে কথা বললেও, বা কাজ করলেও—কিছুটা বড় হওয়ার পর নিজের - নিজের নতুন বাবা মায়ের আদরযত্নে এবং পরিবর্তিত পরিবেশের প্রভাবে সেই পূর্বজন্মের কথা ভুলে যায়।

এত সব পুনর্জন্মের ঘটনা শুনে বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার সব কিছু শেষ

হয়ে যায় না। ব্যক্তির ভিতরকার প্রাণ বা আত্মা অজর, অমর, যে সব দেহ বদল করে। তবে একথা সত্য যে, আত্মা কবে, কখন, কোথায়, কত দিন পরে পুনরায় নতুন দেহ পাবে—বা নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করবে, —তার জন্মগ্রহণের ব্যাপারটা কোন নীতি - যুক্তি - বিচার অনুসারে পরিচালিত হয়—তা জানা বোধহয় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না। ঐ অদৃশ্য, অজ্ঞান, অন্ধকার জগতের অস্তিত্ব ব্যাপারে কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে বটে কিন্তু তা যেন ঐ জাতিস্মরদেরই দান ; ঈশ্বর যেন নিজের খেয়ালে, প্রমাণ হিসেবে তাদের পাঠিয়েছেন।

এই রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞান আজও সম্পূর্ণ অসফল ; বোধকরি চিরদিনই তাই থাকবে।

"শুদ্ধা সনাতনী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা"

শ্রীসত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩য় পর্ব

দীর্ঘদিন বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের পর মা আবার ফিরে এলেন ভক্ত হৃদয়ের আহ্বানে। এই সংসারের নিকেতনে। একটি শান্ত - শুভ্র - মঙ্গল রশ্মির মত। প্রাণঢালা প্রেমঢালা সরলতার মত। অমোঘ সন্তোষ নিয়ে। একটি প্রেমার্দ্র দৃষ্টি নিয়ে, যাতে এই ঘোর দুর্দিনেও ভক্তরা দেখতে পায়, তাঁর প্রেমমুখের প্রসন্নতা। প্রেমমন্ত্রই যে মায়ের মন্ত্র। আর এই প্রেমই মায়ের শ্বাশত বাণী। মনের মাধুর্য্য। আত্মার প্রশান্তি। মা বলেন, "হরিকথাই কথা আর সব বৃথা"। গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল, নন্দদুলাল প্রেমগোপাল।" কিন্তু সেই প্রেমসাধনার রাজ্য, সেই প্রেমগোপালের লীলাস্থল শ্রীধাম বৃন্দাবনও যে আজ শুষ্কপ্রায়। প্রাণহীন। কৃষ্ণের সেই সুমধুর বাঁশরীর সুরধ্বনি আর শোনা যায় না। লীলাভঙ্গে চঞ্চলিত শ্রীরাধারাণীর দেহচ্ছায়াও আজ আর দেখা যায় না। নৃত্য চঞ্চল ধ্বনি গভীর রাতের স্তব্ধতাকে ভেদ করে ঘুরে বেড়ায় নিধুবনে। যমুনার তীরে তীরে। একদিন সে শুভক্ষণে শ্রীরাধারাণী মাল্যদান করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে. যমুনার কলস্বরে কলস্বরে অভিনন্দিত হয়েছিল সে মিলন, সেই যুগল মিলন রাসলীলার সাক্ষী ছিল শ্রীযমুনা। সেই স্মৃতিচারণ করে আজও তাই যমুনা ডাকে। ডাকছে যমুনা তার পুরাতন বৃন্দাবনকে। গভীর রাতের স্তব্ধতায় নির্জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শোনা যায় যমুনার কলধ্বনি। কিন্তু যমুনার সে কলস্বর শুনতে কলক্রন্দনের মতই যেন মনে হয়। সে ডাকে কাঁপন লাগে কালিন্দী নদীর বিষন্নজলে। আনন্দময়ী মার হৃদয়ে। আনন্দময়ী মা শুনতে পেলেন যমুনার সেই কলধ্বনি। কলধ্বনি নয়, কলক্রন্দন। ক্রন্দনধ্বনি নয়, যমুনার করুণ মর্মস্পর্শী হাহাকারে বেদনার্ত হয়ে ওঠে আনন্দময়ী মার দুই

চক্ষু। যমুনার আহ্বানকে পিছনে ফেলে রেখে জ্ঞানাকাশে লীন হতে পারলেন না। জীবদেহ ধারণ করে জীবের সুখ দুঃখকে ভুলে হিমালয়ের নির্জনতায় চির বিশ্রাম নেওয়া আর হলো না। প্রেমঘন মূর্তি নিয়ে আবার ফিরে এলেন হিমালয় থেকে শ্রীবৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে সৃষ্টি করলেন নব বৃন্দাবন। আনন্দময়ী বৃন্দাবন। আর সেই নববৃন্দাবনের নায়িকা হলেন আনন্দ বিলাসিনী শ্রীরাধারাণী নয় শ্রীআনন্দময়ী। আনন্দঘন প্রেমঘন মূর্তির মূর্ত প্রকাশ আনন্দময়ী মা।

অতন্দ্র লীলা বিলাস চলতে লাগলো বৃন্দাবন ধামে, দোল পূর্নিমার উৎসব। হোলি উপলক্ষ্যে নানা জায়গা থেকে ভক্তরা এসেছে। আনন্দময়ী আশ্রম আনন্দে মেতে উঠেছে। মা নিজেই নিজের মাথায় গায়ে রং ও আবির দিতে লাগলেন, এ দেখে ভক্তরা মহা উৎসাহে মাকে রং দিতে লাগলো। আবির খেলা সুরু হয়ে গেল। এবার মা রং দিলেন পণ্ডিত সুন্দর লালজীকে। পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বললেন হরিবাবাকে রং দিতে পারলে তো বুঝতে পারবো। মা হরিবাবার আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। হরিবাবা দোতলায় দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। যাতে কেউ রং দিতে না পারে। মা এসেছেন শুনে ছাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীমা পিকচারি দিয়ে রং দিলেন—শ্রীশ্রীহরিবাবাকে। হরিবাবার আশ্রম থেকে মা এলেন অখণ্ডানন্দজীর আশ্রনে। অখণ্ডানন্দজী মাকে দেখে বের হয়ে এলেন; মা তাঁকেও রং দিলেন। তারপর থেকে হেসে বললেন।

"পিতাজীরা সন্ন্যাসী ঠিকই। কিন্তু যদি পাহাড় পুরীতে চলে যেতেন তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। বৃন্দাবনে যখন থাকা হইতেছে, তখন রং লাগিবেই।" ভক্তবৃন্দ সকলেই হেসে উঠলো। মা আবার অখণ্ডানন্দজীর নিকট হাত জোড় করে বললেন, "পিতাজী বাচ্চির অপরাধ নিওনা"। তারপর হাসতে হাসতে মা ভক্তবৃন্দ সহ চলে এলেন কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে। মা আজ কাউকেই ছাড়ছেন না। দোল উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছেন। সঙ্গে রাজা, মহারাজা, রাণী, মহারাণী ও অন্যান্য ভক্তরাও খালিপায়ে চলেছেন মায়ের পিছু পিছু পথে পথে আশ্রমে, আশ্রমে, কীর্তন করতে করতে, মধুর এই হরেকৃষ্ণ নাম আবার বল। গৌর হরি, হরি বল। মৃদঙ্গ, খোল, করতালের ধ্বনিতে ভক্তবৃন্দের মনে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হলো। মা এবার কাঠিয়া বাবার আশ্রমে গিয়ে মোহন্ত ধনঞ্জয়দাসজী ও অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীদের গায়ে রং দিলেন, এমন কি গরু, তুলসী গাছ কিছুই বাদ দিলেন না; দোল উৎসবে মা নিজেও মাতলেন, ভক্তবৃন্দ সাধু সন্ন্যাসীদেরও মাতালেন। সেইদিনই আবার আনন্দময়ী মার দুইটি শিব প্রতিষ্ঠা হলো। শিবরাত্রির দিনে একটি শিব স্থাপনা করা হয়েছিল, তার নাম গোপেশ্বর। আজ যে দুইটি স্থাপনা করা হলো তাঁদের নাম রাখা হল সিদ্ধেশ্বর ও বাণেশ্বর। ব্রহ্মচারী হিরুর উপর পূজার ভার দেওয়া হলো। মা বৃন্দাবনেই রয়েছেন। এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা, হঠাৎ মা বায়ুমণ্ডলে ও নিজের শরীরের কেবলই পোড়া গন্ধ অনুভব করতে লাগলেন। মা বললেন, শরীরের ভিতর হইতেই এ গন্ধ। অবশেষে জানা গেল নিম্বার্ক আশ্রমের বিগ্রহ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার দলাদলি গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো। মাকেই আবার তার বিচার করতে

হবে। মায়ের উপর যে দুই দলেরই শ্রদ্ধা আছে। মা বললেন, দেখ, ঠাকুর এইভাবে অগ্নিদগ্ধ হলো, এখনও কি বিরোধ করবার সময় আছে? তোমরা সকলে গুরুভাই। উভয়েই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে মিলে যাও। কিন্তু বিরোধ এত সহজে মিটলো না। শেষে কোর্ট-কাছারী পর্য্যন্ত উপস্থিত হলো। মোহন্তজী নিজেই বিগ্রহের পুনঃস্থাপনা বিষয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করলেন। মা বললেন—পুনরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তুমি অন্তঃত কিছুদিনের জন্য অপর পক্ষের হাতে সব ভার দিয়ে অন্যত্র গিয়ে সাধন ভজন কর তাহলে ফল ভাল হয় না কি বাবা? পরে যদি তোমার এই আশ্রমে আসতে অসুবিধা হয় তবে না হয় নূতন আশ্রম করে বৃন্দাবনেই বাস করো। এইসব মামলা মোকদ্দমার ভিতর না গিয়ে নিজের আনন্দে অটুট থাকা ঠিক নয় কি? মা আবার বললেন মোহন্তজীকে, শুনেছি কাঠিয়াবাবার সময়ের এই মূর্তি সন্তদাস বাবাজী নূতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। এই মূর্তির স্থান খালি রাখতে নেই। শীঘ্রই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা দরকার। বিগ্রহাদির ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত লোকের অভাবের কথা জানালেন মোহন্তজী। মা ভক্ত ইন্‌জিনিয়ার শ্রীভুবনমোহন চক্রবর্তীর উপর জয়পুর থেকে বিগ্রহ আনার দায়িত্ব দিলেন। মোহন্তজীও মাকে অনুরোধ করলেন মা যেন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বৃন্দাবন ধামেই থাকেন। অবশেষে বিগ্রহ আনা হলো। মোহন্তজী রং কল্প করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে দিলেন। আশ্রমে শ্রীবদ্রী মাকে আগ্রহ সহকারে নিয়ে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল অপরপক্ষীয় দল নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে বাধা প্রদান করবে। কোর্টে দরখাস্ত করেছে তারা। মা বললেন, যা হয়ে যায়। অধিবাস সংকল্প করে প্রতিষ্ঠার বাধা হচ্ছে। ভয়ানক কথা। ধীরে ধীরে নিম্বার্ক আশ্রমের গণ্ডগোল মেটাবার সমস্ত দায়িত্বই এসে পড়লো আনন্দময়ী মার উপর। মাও সমস্ত দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন। মোহন্তজীর বিরোধী পক্ষের কাছে মা পাঠালেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে নির্দেশ দিয়ে। গুরুপ্রিয়া দেবী তাঁদের বললেন, সংকল্প যখন হইয়া গিয়াছে তখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়া কি সঙ্গত? আমরা ত মায়ের নিকট শিক্ষা পাইয়াছি সব আশ্রমই এক। ভিন্নভাব রাখা ঠিক না। নিম্বার্ক আশ্রমের একজন এসে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন, মায়ের পক্ষ থেকে গুরুপ্রিয়া দেবী যেন কোর্টে যান। তাহলেই মামলার একটা সুরাহা হবে। প্রত্যুত্তরে মা বললেন, বেশ, নিতে চাও নিয়া নাও। গুরুপ্রিয়া দেবী নারায়ণ স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে মথুরা কাছারী গেলেন। মাকে নির্দেশ ও আদেশ পালন করতে, মা বললেন গুরুপ্রিয়া দেবীকে, মোহন্তজীকে বলবে যে এই শরীরের কথা যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য সব ত্যাগ করা—প্রস্তুত থাকা শ্রেয়। গুরুপ্রিয়া দেবীও কাছারিতে গিয়ে বললেন মোহন্তজীকে, আপনাকে গুরু মহারাজ সর্বপ্রধান করে গেছেন। আপনার পদের মর্যাদা রক্ষা করতেই হবে। আপনি দয়া করে লিখে দিন ঠাকুরজীর প্রতিষ্ঠার বাধা দূর করার জন্য আপনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। মারও এই মত। এতে আপনার মর্যাদা বাড়বে বই কমবে না। যে পদমর্যাদা আপনাকে গুরু মহারাজ দিয়ে গিয়েছিলেন তার সম্মান রক্ষা হবে। আমরা কিছুতেই আপনাকে মামলা মোকদ্দমার

মধ্যে যেতে দেবনা। মোহন্তজী মৌন ছিলেন, শ্লেটে লিখে জানালেন—"মা যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব"।

অবশেষে সেই মতই ব্যবস্থা করা হলো। সব ঠিকমত লেখা পড়া হয়ে গেল। উভয় পক্ষের বিরোধ মিটে গেল। ভয় পক্ষই খুশী। মানে তারা কাছারী থেকে ফিরে এলেন। মোহন্তজী বললেন গুরুদেবই আজ মাতৃরূপে এসে এসব করলেন। মাও আনন্দের সঙ্গে বললেন, বেশ হয়েছে। এখন সকলে এসে মিলে মিশে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় কাজে লেগে যাও। ৫ই মার্চ ১৯৫৩ নিম্বার্ক আশ্রমে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলো। মহা মহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো আশ্রম মন্দির সব কিছু। পরবর্তীকালে নিম্বার্ক আশ্রম সম্ব.ন্ধ কথা উঠলেও ভক্ত প্রবর ডাঃ পান্নালালজী বলেছিলেন মাকে এই রকম আর কোথাও পাওয়া যায় না, যে দুই দলই খুশী। মা হেসে হেসে বলেছিলেন, আসল হাইকোর্টের রায় কিনা। ভগবানের রায়। স্বয়ংই প্রতিষ্ঠিত হইলেন যে কেহ কেহ হয়তো মনে করিয়া ছিল যে মা এক পার্টির পক্ষ নিবেন। উহারা তো মানে পিতাজী যে, এই শরীরটা কোন পক্ষ অপেক্ষার মধ্যেই নাই। এই শরীরটার কাছে সব সমান। একচুলও এদিক ওদিক হয় না। সে যা ভাবুক না কেন? এই প্রসাদ মা আবার বলেছেন "গতবার যখন বৃন্দাবন যাওয়া হইয়াছিল মোহান্ত বাবাজী এই শরীরটাকে নিজেদের আশ্রমে নিয়া গিয়াছিল। কীর্তন ইত্যাদি হইল। তাহার পর ফল ইত্যাদি নিয়া নিজের হাতে বসিয়া বসিয়া এই শরীরটাকে খাওয়াইয়া ছিল। এতটা আর অন্য কোন সময় হয় নাই। তখনই এই শরীরটা ছোটবেলায় একটি গল্প তাহার কাছে বলিয়াছিল। নিবার্ক আশ্রমের যে মূর্তি এখন বদলান হইল সেই মূর্তি যখন সন্তদাস বাবাজী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন এই শরীরটা বিদ্যা-কুটে ছিল। শরীরের জ্যেঠিমা ছিলেন সন্তদাস বাবাজীর ভগ্নী। তাহার নিজের ছেলেমেয়েরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠার উৎসবে বৃন্দাবন গেল। সন্তদাস বাবাজী এই শরীরের পিতাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি নাকি এই শরীরের পিতা-মাতা সকলকেই প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু একথা তখন কেহই জানায় নাই। আর এই শরীরের জ্যেঠিমা এই শরীরটাকে এত ভালবাসিত যে নিজের বড় মেয়ের কাছেও এত মন খুলিয়া কথা বলিত না। আর কি বলিত জান যে এর কাছে কথা বলা তো কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া রাখা'। কিন্তু আশ্চর্য্য এই শরীরকে জেঠিমা এত আদর স্নেহ করা সত্ত্বেও একবারও যাইতে বলিলেন না। তখনই এই শরীরের একটু হাসি আসিল এই তো জীব স্বভাব। একটু থেমে গেলে মা আসবে বলছেন, এবার যখন ঠাকুরের দগ্ধ মূর্তি দেখা গেল তখন ঠাকুরের সারা অঙ্গে হাত বুলাইয়া দিয়া বলা হইল, ঠাকুর তুমি যে এই মূর্তিতে দেখা দিলে? আবার যখন সেদিন নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল তখনও আবার বিগ্রহের সারা শরীরে হাত বুলাইয়া গায়ে মাথাটি ছোঁয়াইয়া এই খেয়ালটি, পিতাজী, কেমন এক ভাবে আমি যে, ঠাকুর সেবরে প্রতিষ্ঠায় আনলে না। এবারের প্রতিষ্ঠায় শরীরটাকে তোমার কাছে রাখবে বলেই কি তোমার এই দগ্ধ মূর্তিতে প্রকাশিত হতে হল?"

ধীর গম্ভীর নিগূঢ় অর্থপূর্ণ করুণা মাখা মায়ের মুখ নিঃসৃত কথাগুলি শুনতে শুনতে ভক্তবৃন্দও চিন্তান্বিত হলেন। করুণায় ভরে উঠলো তাদের মন। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি সব দিকেই আছে। সন্ত দাস বাবাজীর আশ্রমের মোহন্ত ধনঞ্জয় দাস বাবাজীর যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেইজন্য স্বামী পরমানন্দজীর রায়পুর আশ্রমে মোহন্ত বাবাজী কিছুদিন একান্তে বাস করেন। শ্রীশ্রীমা এখন কাশীতে। আশ্রমে গীতা জয়ন্তী সুরু হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় এসেছেন। দেবী ভাগবৎ সপ্তাহ, বাসন্তী পূজা ও গীতা জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কাশীর আশ্রমে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। সোলনের রাজা সাহেব, টিহরীর মহারাজা, মহারাণী, রাজারাণী ও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ, অসাধারণ বহু ভক্ত এসেছেন আনন্দ উৎসবে। মহা মহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে কাশীর আনন্দময়ী আশ্রম। এই আনন্দ উৎসবেও আম্বের রাজা রাণীর মনে শান্তি নেই। তাদের একমাত্র পুত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থা। আনন্দময়ী মাও গুরুপ্রিয়াদেবীকে রাত্রে হঠাৎ ডেকে বললেন, ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি দেখছি, আবার একদিন মা বললেন হঠাৎ একটা কথা শুনলাম 'কাল চলে যাবো'। কল্পতলির লক্ষ্য যেন দেখবনা

মা এবারে ব্রহ্মচারী কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে যে ঘরে ছেলেটি শুয়ে ছিল সেখানে গেলেন এবং ব্রহ্মচারীকে নাম জপ করতে বললেন মৌন হয়ে। কেউই কিছু বুঝতে পারলেন না। মা নীরবে সব কিছু করতে লাগলেন ছেলেটির মঙ্গলের জন্য।

ইতিমধ্যে আরও একটি ভয়ংকর মূর্তি মা দেখলেন। লালরং, জিহ্বা লক্ লক্ করছে, মা তাকে বারবার আদেশ করলেন অন্য দিকে চলে যাওয়ার জন্য। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে অন্তর্হিত হলো। আশ্চর্য্য ব্যাপার এর পর থেকেই ছেলেটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। মার কৃপা কখন কিভাবে যে কার উপর বর্ষিত হয় কেউ বলতে পারে না।

মা বললেন, খেয়াল হলে এই রকম হয়। আবার খেয়াল না হলে কিছুই হয় না। হয়ত বসে বসে তামাসা দেখার মত দেখছে। যা হয়ে যায়।" এইভাবে মা কালীর লীলা সাঙ্গ করে রওনা হলেন কলকাতার পথে। কলকাতায় এসে উঠলেন এক ডালিয়া রোডের আশ্রমে। অগণিত ভক্ত সমাগম হলো। এত ভিড় যে মানুষ চাপা পড়ার অবস্থা। মা বেশী সময় থাকতে পারলেন না। বের হয়ে পড়লেন। ভোগের ব্যবস্থা হয়েছে ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত সুবোধ রঞ্জন দাশগুপ্তের বাড়িতে। তিনি ছিলেন মহীশূর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশ্রীমায়ের পরম ভক্ত। সেখান থেকে আরও কয়েকজন ভক্তের বাড়ী পদধুলি দিয়ে সোজা এসে উপস্থিত হলেন হাওড়া ষ্টেশনে। যাত্রা করলেন শ্রীক্ষেত্রের পথে। পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনে করে। সঙ্গে চললেন ভক্ত প্রবর শশধর ভট্টাচার্য্য। শ্রীনির্মল চক্রবর্ত্তী, শ্রীদিলীপ কুমার দত্ত, শ্রীমান সুবিমল, শ্রীসুনিল বসু, শ্রীমতী রেখা ও ব্যাঙ্গালোরের অরবিন্দ বসু। ১৯৫৩ সালের

২০শে এপ্রিল মা ভক্তবৃন্দ সহ এসে পৌঁছালেন পুরীধামে পুরীতে আবার মার সুক্ষ্ম দর্শন হলো। মা দেখলেন অতি সুন্দর সুন্দর চিহ্নযুক্ত ১০০৮টি নারায়ণ শিলা। নিকটে আরও কেউ ছিল। সে যেন বলছে (শ্রীশ্রীমাকেই দেখিয়ে)। ঐ মূর্তিটি নারায়ণ শিলা দিয়ে করতে হল না। আর ঐ সব নারায়ণ শিলা দর্শন করেই বোধ হয় মা ফিরবার পথে জগন্নাথ মন্দির হয়ে ষ্টেশনে এসেছিলেন। প্রবাদ আছে যে জগন্নাথ দেবের বেদীর নিচে অনেক অমূল্য নারায়ণ শিলা রাখা আজে। এই সেই শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দেবের মহান তীর্থক্ষেত্র। (চৈতন্য) মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র। একদিন এখানকার মাটি আর বাতাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরি নাম কীর্তনের সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে থাকতো। ভক্ত কণ্ঠের হরিনাম গানে আর সুধাশ্রায়িত মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রেম জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, ডুবিয়ে দিয়েছিল শ্রীক্ষেত্রের স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা। আজও তাই মনে হয় শ্রীক্ষেত্রের পথে পথে কৃষ্ণ গুণগান করতে করতে হেলে দুলে যায় গৌর কিশোর সঙ্গে নিতাই আনন্দ মঞ্জরী। শ্রীগৌর সুন্দরের কথা ভাবতে ভাবতে শ্রীমাও যেন আজ নয়ন জলে ভাসতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কেন জানি উদাস হয়ে যায় মায়ের মন। গৌরাঙ্গ সুন্দরের ছাওয়া যে ক্ষেত্রের মাটি আর আকাশ বাতাস। এই তো সেই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি। শ্রীমহাপ্রভু নিজে হাতে দিয়ে দিলেন। হরিদাস ঠাকুরের মত ভক্ত আর হয় না। কি দৈন্য তার। শ্রী জগন্নাথ দর্শন করতে পর্যন্ত যেতেন না। মন্দিরের কাছেও তিনি যেতেন না। পাছে জগন্নাথের সেবক তাকে ছুঁয়ে ফেলে। দূর থেকে দেখে তিনি মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করতেন, আর অমনি মহাপ্রভুও বুকে জড়িয়ে ধরতেন ভক্তপ্রাণ হরিদাস ঠাকুরকে. শ্রীহরিসাস ঠাকুর বললেন প্রভু। আমায় ছোঁবেন না, আমি অস্পৃশ্য যান। এত করুণা কেন প্রভু। শ্রীমহাপ্রভু দৈন্য করে বলতেন, আমি "আমি. তোমায় আলিঙ্গন করে নিজে ধন্য হই, তুমি দৈন্য ছাড়।' হরিদাস ঠাকুর থাকতেন মন্দির থেকে অনেক দূরে। নির্জন বাগানে। যেথানে রোজ তিনি লক্ষ হরিনাম জপ করতেন। মহামন্ত্র জপ। ভক্তকে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুনদ এসে রোজ দর্শন দিতেন। ভোরে সর্বপ্রথম জগন্নাথ দেবকে দর্শন করেই দর্শন দিতেন হরিদাস ঠাকুরকে। হরিদাস ঠাকুরের গায়ে রোদ লাগত। তাই শ্রীমহাপ্রভু বকুলের ডাল দাঁতন করতে করতে সেখানে পুঁতে দিলেন। অতি দ্রুত গাছ বড় হলো। ছায়াও হলো। আর তার তলায় বসে মহানন্দ নাম করতে লাগলেন হরিদাস ঠাকুর এমনই হোল ভগবানের ভক্ত বাৎসল্য লীলা। বৃক্ষের ভিতর শাঁস হলো না। শুধু বল্কলের উপরেই বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে রইলো। এরও একটা কারণ আছে। পরবর্তী কালে শ্রীজগন্নাথের রথ তৈরী করবার জন্য ঐ গাছ কাটবাব কথা হয়েছিল। মিস্ত্রীও এল গাছ কাটতে, কিন্তু কি আশ্চর্য, গাছ কেটে কি হবে। গাছের যে শাঁসই নেই। সকলে বুঝলো বৃক্ষটি মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গী যে, তাকে কেটে ফেলা, মুছে ফেলা কি এতই সহজ। একদিন হরিদাস ঠাকুর অসুস্থ হয়েছেন। মহাপ্রভু এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? প্রত্যুত্তরে

হরিদাস ঠাকুর বললেন, আমার অসুস্থ বুদ্ধি আর মন। নাম সংখ্যা ঠিক মতন করতে পারছি না। মহাপ্রভু বললেন, তোমার তো সিদ্ধদেহ তবে এত সাধন কেন? তোমার জন্যই তো আমার এ সাধনা। প্রভু! আমার একটী প্রার্থনা তোমার পূরণ করতে হবে। তোমার অ-প্রকট লীলা আমি দেখতে পারবো না। আমায় শেষ সময় তুমি এসে তোমার শ্রীচরণ আমার মস্তকে দেবে এবং আমার নয়ন ভৃঙ্গ তোমার মুখ কমল মধু পান করতে করতে আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতেই যেন দেহ লীলা সম্বরণ হয়। শ্রীল মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের এ প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। ভক্ত যাই বাঞ্ছা করবেন তাই তিনি দিতে যে বাধ্য। নইলে ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু এ নাম যে থাকে না। তারপর হরিদাস ঠাকুর একদিন সত্য সত্যই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কাছে এলেন। শ্রীচরণ মস্তকে দিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নয়ন ভৃঙ্গ শ্রীমহাপ্রভুর মুখপদ্মে ডুবে গেল। আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলতে প্রাণ কৈল উৎক্রমণ। এবারে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে উঠিয়ে তিনি বক্ষে তুলে নিলেন। তারপর স্কন্ধে রেখে নৃত্য করতে লাগলেন। মহাপ্রভু তাকে সমুদ্রে নিয়ে স্নান করিয়ে বললেন, আজ শ্রীহরিদাসের পাদপদ্ম স্পর্শ সমুদ্র মহাতীর্থ হোল। পুরীর সমুদ্র বৈষ্ণবদের মহাতীর্থই বটে।

শ্রীক্ষেত্রের এই মহাতীর্থে এসে সমুদ্র দর্শন করে মায়েরও ভাব হলো। হরিদাস ঠাকুরের ভাব। মা যেন গৌর সুন্দরের শ্রীক্ষেত্রের লীলা প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁদের কণ্ঠে নিঃসৃত নামগানও যেন শুনতে পাচ্ছেন। সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে নাম। কেহ কৃষ্ণনাম করছে, কেহ শ্যাম সুন্দর বলছে, কেহ রাধারমণ বলছে, কেহ বৃন্দাবন বিহারী বলছে। সব নামই সেই কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে। গৌরসুন্দর রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন। আকুল কণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে বলছেন, কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও। দেখা দাও। আর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা বইছে। শ্রীশ্রীমায়েরও তখন অপূর্ব মুখশ্রী। মধুর চাহনি আর গদ্‌গদ্ ভাব দেখে,ভক্তরা বলছেন যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে প্রকার ভাবাবেগের কথা বইতে পড়েছি তাই আজ মায়ের অঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি। সে সময় মায়ের আধো আধো জড়ানো কথা সমবেত ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃত রসে পূর্ণ করে তুললো। মাও ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, নাম কর। নাম কর। নামেই সব হবে। নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপ সাগরে ডুব দেওয়া যায়। নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তা আপনা হতেই ফুটে ওঠে।

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল নন্দ দুলাল প্রেম
গোপাল।

(ক্রমশঃ)

"চরিত্র সুন্দর হয় সত্যের আলোতে।
চরিত্রই শ্রেষ্ঠ ধন মানব জগতে॥"

—শ্রীতারাচরণ

শ্রীমদ্-ভাগবতসার

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী (প্রয়াত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০/৭, শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত বধ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন,—শ্রীহরির যে সকল লীলাকথা শ্রবণ করলে হরিভক্তি জন্মে ও হরিভক্তের সঙ্গে সখ্যতা হয় তা বলুন। হে প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের মতই আচরণ করেছিলেন, আপনি তাঁর সেই অপূর্ব বাল্যচরিত্র বর্ণনা করুন।

শ্রীশুকদেব বললেন,—বালকেরা তিন-চার মাসে উপুড় হতে চায়. তখন এক উৎসব হয়, তাকে বলে উত্থানিক উৎসব। গোপালকে নিয়ে ব্রজে সেই উৎসব হচ্ছিল। যশোদা চান করিয়ে বালককে একখানি শকটের নীচে ছায়াতে শুইয়ে রেখেছিলেন। সকলেই উৎসবে মত্ত, বালকের কান্নায় কেউ কান দেয় নি। স্তনার্থী বালক কাঁদতে কাঁদতে উপরের দিকে পা ছুঁড়ে দিচ্ছিল। শিশুর ক্ষুদ্র প্রবালসদৃশ রক্তবর্ণ কোমল চরণাঘাতে সেই বৃহৎ শকটটি উল্টিয়ে পড়ে গেল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি এবং কাঁসার বাসনপত্র সব উল্টিয়ে পড়ে ভেঙ্গে গেল। শকটের চাকা, জোয়াল ভেঙ্গে গেল। ব্রজরমণীগণ, নন্দ-যশোদা সকলেই এই দৃশ্য দেখে শঙ্কিত হলো। শকট কি করে উল্টে পড়ে গেল ? বালকেরা বলল, —এই শিশু পা দিয়ে লাথি মেরে গাড়িটি ফেলে দিয়েছে। বালকদের কথা গোপগণ বিশ্বাস করলো না। দুষ্ট গ্রহের কাজ মনে করে যশোদা পুত্রকে কোলে করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করিয়ে তার মঙ্গলকামনা করলেন।

একদিন যশোদা পুত্রকে কোলে নিয়ে পাথরের মত ভারি মনে করলেন, তাকে তখন কোল থেকে নামিয়ে রাখলেন। ভগবানের নাম নিয়ে যশোদা নিজের কাজে চলে গেলেন। কংসের চাকর তৃণাবর্ত দৈত্য কংসের আজ্ঞায় বৃন্দাবনে এসে ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করে প্রাঙ্গণ থেকে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তৃণাবর্ত গোকুলকে ধূলোতে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হাওয়ায় শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছিল। ধূলোর জন্যে কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। যশোদা পুত্রকে খুঁজছেন। ঝড় থেমে গেলে গোপীরা যশোদার কান্না শুনে তাঁর কাছে গেলেন। তৃণাবর্ত দানব ঝড়ের আকার ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করে আকাশ পথে যাওয়ার সময় তাঁর ভার বইতে না পেরে তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শিশু ততক্ষণে তৃণাবর্তের গলা বেষ্টন করে ধরেছে। দৈত্য শিশুকে কিছুতেই গলা থেকে ছাড়াতে পারছে না। দৈত্য তারফলে চলতেও পারছে না। তার চোখ দুটি যেন বেরিয়ে আসছে, অব্যক্ত শব্দ করতে করতে বালককে নিয়ে তার মৃতদেহ ব্রজমধ্যে পড়ে গেল। ব্রজাঙ্গনাগণ শিশুকে দানবের বুকের উপর থেকে নিয়ে যশোদাকে দিল। মৃত্যুর মুখ থেকে শিশুকে ফিরে আসতে দেখে গোপ-গোপীগণ ও নন্দ-যশোদা আনন্দিত হলেন। গোপরাজ নন্দ তাঁর বাসস্থান বৃহৎবনে এইসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিতচিত্তে বারবার বসুদেবের কথা স্মরণ করেছিলেন।

একদিন যশোদা পুত্রকে স্তন্যদান করতে করতে দেখলেন, শিশুর স্তন্যপান হয়ে গেলে সে হেসে হাই

তুলছে। তখন যশোদা বালকের মুখের মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য সব দেখে আশ্চর্য হয়ে চোখ বুজে ফেললেন।

১০/৮, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন

শুকদেব বললেন, —হে রাজন্. গর্গ মুনি যদু-গণের পুরোহিত ছিলেন। বসুদেব তাঁকে ব্রজে নন্দরাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নির্জনে দুই বালকের নামকরণ করে দিলেন। তিনি বললেন, এই রোহিনীনন্দন সকলের মনোরঞ্জন করবেন, এই জন্য এঁর নাম রাম। ইনি বলবান হবেন তাই নাম হবে বলদেব। যাদবগণের মধ্যে বিবাদ হলে ইনি মিটিয়ে দেবেন, তাই এঁর আর এক নাম হবে সঙ্কর্ষণ। অন্য পুত্রটি

আসন্ বর্ণাস্বরোহ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণাতাং গতঃ॥

প্রতি যুগে তোমার এই পুত্র শরীর গ্রহণ করেন, এঁর শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হয়ে থাকে, বর্তমানে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হয়েছেন।

ইনি বসুদেবের পুত্র বলে এঁকে বাসুদেবও বলা হয়। তোমার ছেলের বহু গুণ ও কর্ম অনুরূপ অনেক নাম ও রূপ আছে। এই বালক গোকুলের এবং গোপবৃন্দের অনেক উপকার করবেন। তোমার পুত্র গুণে, সম্পদে ও প্রতাপে নারায়ণের সমান। বিশেষ সাবধানে এঁকে পালন করবে।

এই কথা বলে গর্গাচার্য নিজগৃহে চলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিতে লাগলেন। তাঁদের দেখে ব্রজের গোপগোপীগণ খুবই আনন্দিত হতেন। এই দুই ভাইয়ের দুই মা স্তনদানকালে তাঁদের ঈষৎ হাস্য ও অল্প দন্তযুক্ত মুখ দর্শন করে আনন্দ লাভ করতেন। রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই বাছুরের লেজ ধরে টানাটানি করে আর অঙ্গনাগণ তা দেখে বড়ই মুগ্ধ হন। দুটি বালকই বড় চঞ্চল। অল্পদিনের মধ্যেই দুই ভাই হাঁটতে শিখে গেলেন। রামের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খেলা করতেন, অন্যান্য বন্ধু ব্রজবালকদের সঙ্গেও হুড়াহুড়ি করতেন। তা দেখে ব্রজাঙ্গনাগণের পরম আনন্দ হত। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর চাপল্য দেখে যশোদাকে বলত,—তোমার কৃষ্ণ বাছুরের গলার বাঁধন খুলে দেয়। আমরা রাগ করলে সে হাসে। চুরি করে দই দুধ ক্ষীর ননী খায়। খেতে খেতে বানরদের ডেকে দিয়ে দেয়। ঘরে ঢুকে কিছু না পেলে ঘুমন্ত শিশুদের জাগিয়ে কাঁদিয়ে দেয়। কোন পাত্রে কি আছে, তোমার পুত্র তা বিলক্ষণ আন্দাজ করতে পারে। উচুঁতে টাঙ্গানো থাকলে হাঁড়ি ফুটো করে খায়। আমরা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকলে তখন সে ঠিক কাজটা সেরে ফেলে। তোমার ছেলেটি আচ্ছা চোর। তোমার সামনে ভালমানুষের মত থাকে, যেন কিচ্ছুটি জানে না। —পাড়ার মেয়েরা শ্রীকৃষ্ণের ভীতু ভীতু মুখের ভাবটি দেখার জন্যই এসব কথা বলে। যশোদা সব শুনে হাসলেন, শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করতে ইচ্ছা করল না।

একদিন রাম দৌড়ে এসে যশোদাকে বলল,—কৃষ্ণ মাটি খাচ্ছে। যশোদা পুত্রের হাত ধরে বকাঝকা করলেন। পরে বললেন,—তুমি গোপনে মাটি খেয়েছ, তোমার সাথীরাও বলছে, তোমার দাদা বলরামও বলছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভি সাং নিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্॥

যন্ত্বেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজ বালকঃ॥

মা, আমি মাটি খাই নি, এরা সবাই মিথ্যে কথা বলছে, আমি হা করছি, তুমি তাকিয়ে দেখ তাহলেই বুঝতে পারবে। যশোদা বললেন,—ঠিক আছে, তুমি মুখ হা করে দেখাও। তখনই ভগবান্ হরি বাধ্য বালকটির মত মুখ হাঁ করে দেখালেন।

যশোদা কৃষ্ণের 'মুখের মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, পর্বত, পৃথিবী, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য সবকিছু দেখতে পেলেন। নিজেকে এবং সমস্ত ব্রহ্মপুরীকেও বালকের মুখের মধ্যে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। পুত্রের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য দর্শন করে যশোদা পুত্রকে ভগবান জ্ঞানে প্রণাম জানালেন। যশোদা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হলে শ্রীকৃষ্ণ বৈপ্লবী মায়া বিস্তার করে তাঁর স্মৃতি নষ্ট করলেন। গোপী যশোদা তখন নিজ পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। তিন বেদ যাঁকে যজ্ঞপুরুষ, উপনিষৎ যাঁকে ব্রহ্ম, সাংখ্য যাঁকে পুরুষ, যোগ যাঁকে আত্মা, ভক্তগণ যাঁকে ভগবান্ বলে মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, সেই হরিকে যশোদা নিজ পুত্র বলে মনে করতেন।

তখন রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রহ্মন্, নন্দ এবং যশোদা এমন কি পুণ্য করেছিলেন যার জন্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কোলে পুত্র হয়ে এসেছিলেন, যশোদার স্তন পান করেছিলেন? পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকী অথচ তাঁর বাল্যলীলার স্বাদ পান নি।

শ্রীশুকদেব বললেন—রঘু এবং দ্রোণ নিজপত্নী ধরার সঙ্গে ব্রহ্মার আদেশ পালন করবার জন্য বলেছিলেন—হে ভগবন্, আমরা দুজন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে ভগবান্ শ্রীহরিতে যেন আমাদের পরম ভক্তি জন্মে। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলেছিলেন। তাই দ্রোণ ব্রজমণ্ডলে নন্দ এবং দ্রোণপত্নী ধরা যশোদা হলেন। জনার্দন পুত্র হয়ে জন্মালে সমস্ত গোপ গোপীগণের মধ্যে নন্দ ও যশোদাই অতিশয় ভক্তিযুক্ত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আদেশ সত্য করবার জন্য বলরামের সঙ্গে ব্রজে বাস করবার সময় পুত্ররূপ লীলার দ্বারা সকলেরই প্রীতি সম্পাদন করেছিলেন। (ক্রমশঃ)

এই যে ধুলো আমার না এ

মনোতোষ দাশগুপ্ত, জ্ঞানব্রত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মন্দির গাত্রে সাদা পাথরে উৎকীর্ণ দেখলাম "মাতৃপদে কোকনাদ শায়িত শ্মশানে / পিতৃব্য কৈলাসচন্দ্র রিক্তহস্ত দানে / উদাসী 'রসিক' তথা তারাচরণ পিতা / উঠিলা এ দেব মন্দির স্মরি দুই ভ্রাতা" নীচে লেখা 'অর্পণে ঝুলন দে।' মনে হয় কোনো এক ঝুলন দে পরবর্তীকালে এই প্রস্তরলিপিটি মন্দিরগাত্রে প্রোথিত করেছেন। নতুবা হিসেব মেলে না যে! 'সাধনার আলো' (নির্মলচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত)-তে দেখছি বাবা বলছেন, "জ্যেঠামশায় ছিলেন পুরুষের মত পুরুষ, তিনি বড় বুদ্ধিমান ছিলেন; মন্দিরের শ্রীশ্রীকৈলাসেশ্বরী কালী মন্দির) গাত্রে লিখে দিয়ে এসেছি··· "মাতৃপদ-কোকনদে ইত্যাদি"। এই মন্দিরকে বলা হয়েছে 'পূতাস্থি মন্দির'। মন্দিরের সামনে বেশ প্রশস্ত নাটমন্দির। নাট মন্দিরের দেয়ালে সাধুবাবার সুভাষিত উৎকলিত আছে। ডানদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে তারাকুণ্ডে। এই কুণ্ডে কাপড় কাচা বা অন্যভাবে নোংরা করার বিরুদ্ধে নিষেধ বাণী টানানো আছে। নেমে গিয়ে জলে হাতমুখ ধুয়ে জল মাথায় দিলাম। ইতিমধ্যে সুনু, মমতা ও অনুদি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া কাপড় পরালেন সাধুমা ও সাধুবাবার মূর্তিকে। তারপর সেই মূর্তির ছবি তুললাম। পুজো হবে এবার। সবাই সেখানে ভিড় করলেন। এদিকে মাইকে অবিরত ধর্মসঙ্গীত বাজছিল। এবার সেই সঙ্গীত বন্ধ হয়ে কীর্তন শুরু হল। পল্লীর মহিলারা দল বেঁধে এসেছেন। মুহুর্মুহু হুলুধ্বনি উঠছে, শাঁখ বাজছে। আমি মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে এসে গ্রাম পরিক্রমায় বের হলাম। হঠাৎ মনে হল খিদে পেয়েছে। কাল সাধুমার বাড়ি থেকে আনা মুড়কি ও তিলমুড়ির মোয়া খেতে খেতে চললাম। জলের বোতল তো কাঁধের ব্যাগে ছিলই। মন্দিরের পিছনে এলাম। পূতাস্থি যেখানটায় প্রোথিত—দেখলাম। গ্রামবাসীরা ওখানে ধূপকাঠি জ্বালান, মোমবাতি জ্বালিয়ে যান। একটা লাল বস্ত্র জড়ানো বটগাছ দেখলাম, ঠিক যেমনটি ধলঘাটে দেখেছিলাম। পরিষ্কার ইটে বাঁধানো সরু রাস্তা চলে গেছে গ্রামের অভ্যন্তরে যুবতী মেয়ের সিঁথির মতো। শিমূল গাছে লাল ফুল ফুটে আছে, কিছু ফুল মাটিতে পড়ে ঘাসের বিছানাকে রাঙা করে রেখেছে। এখনো শিমূল গাছের সব পাতা ঝরে যায়নি। ছোট ছোট পুকুর দেখলাম রাস্তার ধারে। আবার অটো রিক্স এবং / বা রিক্স-ও চলছে ওই রাস্তায়। এদিকে আবার শ্যালো পাম্প-এ জলসেচ হচ্ছে চাষের ক্ষেতে। স্কুল আছে। একটা কলেজও আছে দেখলাম। নাম আশালতা কলেজ—একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির জন্য; ওঁরা বলেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।

অনেকটা এগিয়ে গেলাম গ্রামের পথ ধরে। বড়ো পুণ্যস্থান এই গুজরা। সাধুবাবার জন্মস্থান হিসাবে তো বটেই! তাছাড়া এখানে জন্মেছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন, ভারতের মুক্তিযুদ্ধের সেরা সৈন্যধক্ষ্যদের একজন, বহু মুক্তি-সেনানীর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু; 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'—তাদেরই একজন পুরোধা পুরুষ। কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে তাঁকে নিয়ে—একেকটা

একেবারে গল্প কাহিনীর মতই চমকপ্রদ। কত গল্প-উপন্যাস-চলচ্চিত্র রচিত হয়েছে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে! এই গুজরায় জন্মেছিলেন প্রখ্যাত রসায়ণ বিজ্ঞানী প্রিয়দা রঞ্জন রায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র আধুনিক জটীল যোগ-রসায়নের অন্যতম পুরোধা এই বিজ্ঞানী তাঁর অনন্য সাধারণ গবেষণা কর্মের জন্য সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী কিল্‌ম্যান (জুনিয়র) কলকাতার রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন ; সামনের সারিতে উপবিষ্ট অধ্যাপক রায়কে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের জটীল-যোগ রসায়নের জ্ঞানের অনেকটাই পাওয়া অধ্যাপক রায়ের কাছ থেকে।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর। অধ্যাপক ও বিশুদ্ধ রসায়নের বিভাগীয় প্রধানের থেকে অবসর নিয়ে তিনি "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব্ সায়েন্স'-এর অবৈতনিক অধিকর্তা হয়েছিলেন। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিষ্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিষ্ট্রি-র পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে 'হিষ্ট্রি অব্ কেমিষ্ট্রি ইন এন্‌সিয়েন্ট অ্যাণ্ড মিডাইভ্যাল ইণ্ডিয়া' নামে প্রকাশ করেন। 'চরকসংহিতা' ও 'সুশ্রুত সংহিতা'র 'ইংরাজি সংক্ষিপ্তসার তিনি রচনা করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি কিছু দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হয়েছিল। কলকাতার বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে যে গ্রাম্য যোগাশ্রম আছে, তার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারীও এই গুজরার মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে নির্মিত আদ্যাপীঠের বিগ্রহ যিনি স্বপ্ন দেখে ফোর্ট উইলিয়ামের পুকুর থেকে উদ্ধার করেন, সেই অন্নদা ঠাকুরের জন্মও এই গুজরায়। এই গুজরা গ্রামেই জন্মেছিলেন 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'ক্লিওপেট্রা', 'ভানুমতী', 'প্রবাসের পত্র', 'অবকাশরঞ্জিনী', 'খৃষ্ট', 'অমৃতাভ', 'অমিতাভ', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'আমার জীবন' (আত্মজীবনী), গীতা ও চণ্ডীর কাব্যানুবাদের জন্য সুবিখ্যাত নবীন চন্দ্র সেন (জন্ম ১০- ২০.৮৪৭, মৃত্যু ২৩. ১. ১৯০৯)। এসব ভাবতে ভাবতে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। খেয়াল হতে ফিরলাম। সাধুবাবার আবির্ভাব উৎসব কিন্তু গুজরায় বড় করে অনুষ্ঠিত হয় না। সেই উৎসব হয় ধলঘাটে। সাধুবাবার আবির্ভাব ঘটেছিল পঞ্চম দোলের দিন। কিন্তু ধলঘাটে প্রতি বৎসর দোলের আগের দিন ও দোলের দিন মহাসমারোহে উৎসব হয়। দশ হাজারেরও বেশী ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগ দেন। ধলঘাটে সাধুমার জন্মোৎসব হয় ছোট করে। গুজরায় যেহেতু দোল উপলক্ষে শ্রীমৃদুল দে-র বাড়িতে বিরাট বৈষ্ণব সেবা-উৎসব হয়, সেই গুজরায় সাধুবাবার জন্মোৎসব নমো নমো করে সারা হয়। মার জন্মোৎসব সেখানে হয় বড় করে। কলকাতায় এই উৎসব পঞ্চম দোল থেকে শুরু হয়ে পরের রবিবার পর্যন্ত চলে। শনিবার সন্ধ্যায় হয় ধর্মসভা (সর্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করার অভিপ্রায়ে) এবং রবিবার সকালে হয় আবৃত্তি, আলোচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ। উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে সমাবর্তন উৎসব। দুপুরে হয় নর নারায়ণ সেবা। আগে সেখানেও উৎসব হত দোলের দিন।

ফিরে এসে রোমাঞ্চিত দেহে প্রবেশ করলাম সাধুবাবার জন্ম ভিটেতে। ঢুকেই ললাটে নিলাম পবিত্র মাটির তিলক। বঁদিকে একটি উঁচু স্থান —সাধুবাবার ঘর ছিল এটি। আরও এগিয়ে বাঁদিকে একটি ঘর, বেশ উঁচু দ ওয়া। শুনলাম এটা নাকি সাধুবাবার মা অমলা দেবীর ঘর ছিল। এদিকে জানা ছিল যে সাধুবাবাদের বাড়িতেই একটি বৌদ্ধ উপাসনাগার ছিল। এ ছাড়া গ্রামে আরেকটি বুদ্ধ মন্দির ছিল, দত্তদের। চট্টলী ভাষায় ভগবান বুদ্ধকে 'ফয়া' বলা হয়, আর বৌদ্ধ মন্দিরকে বলা হয় 'কেয়াং'। অনিল বরণ চৌধুরির সাধুবাবার জীবনী গ্রন্থে আছে: "গ্রামের বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে তারাচরণ বুদ্ধের ধ্যান মগ্ন মুর্তির সম্মুখে বারবার মাথা ঠোকে। বারবার প্রার্থনা জানায়, "হে ফয়া, তোমার মত যেন ধ্যানে বসতে পারি। তোমার মত যেন সব ত্যাগ করতে পারি। ..."বুদ্ধের ত্যাগ দীপ্ত জীবন বালককে অনুপ্রেরণা জোগায়। বুদ্ধের ভাবনায় সে বুঁদ হয়ে বসে থাকে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে বসে কাটিয়ে দেয়।" পাঁচিদি বলেছিলেন, বাড়ির ছোট মন্দিরেও তারাচরণ বুদ্ধের ধ্যান করতেন। মন্দির, এই একটা ঘর আর কী! পাঁচিদি অনেক খুঁজলেন ওই ঘরটা। তারপর প্রাগুক্ত ঘরটি দেখিয়ে বললেন, 'এটাই বোধ হয় সেই মন্দির।' ঠিক সমাধান হল না। আরও এগিয়ে একটু উঁচুতে সাধুবাবার জন্মের স্থানটুকু—অর্থাৎ যে আঁতুড় ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ছোট্ট জায়গাটি বুক সমান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সামনেটা ফাঁকা, ভিতরে ঢোকার জন্য। মধ্যস্থলে পর পর তিন থাক সমকেন্দ্রীয় বৃত্তাকার বেদী—একেবারে উপরের থাকে পাথরের লালাভ কমলকলি। চারিদিকে গাছ, কিছু ডাল নুইয়ে দিয়েছে পাঁচিলের ওপর—সোনাঝুরি গাছ, বেত গাছ, রাধাচূড়া জাতীয় গাছ।

সাধুবাবার এই জন্মভিটে সমাধি মন্দিরের মূল প্রবেশ পথের (বিগ্রহের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে) ডান দিকে। বাঁ দিকে তারাকুণ্ডের অপর পাড়ে এখনো আছে সেই পর্ণ কুটির—সাধুমায়ের নিঃসঙ্গ সাধনার স্থান। অবতার পুরুষদের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের তবু বিবরণ পাওয়া যায়। স্বয়ংসিদ্ধ সাধুবাবার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আমাদের লোকমাতাদের সাধনার বর্ণনা বিশেষ পাওয়া যায় না। ক্বচিৎ কখনো কথার ফাঁকে তাঁদেরই শ্রীমুখ থেকে হয়ত বেরিয়ে পড়েছে। যেমনটি ঘটেছিল সারদাদেবীর বেলায়। দক্ষিণেশ্বরে ওই এক রত্তি নহবত ঘরে পা গুটিয়ে রাত্রি যাপন, লোকলজ্জার জন্য ভোর হবার আগেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন—আর তার উপর লক্ষবার নাম জপ। এ তিনি নিজ না বললে জানা যেত কী করে? অবতার পুরুষেরা ছাইচাপা আগুন, আর লোকমাতারা ছাই, মাঝে মাঝে চকিতে বহ্নিমান হয়েই নিভে যান।

ভক্তরা দেখেছে সাধুমা, সাধুবাবার কাছে আগত ভক্ত মণ্ডলীর অন্ন প্রসাদের জোগাড় করছেন, শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে তাদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করছেন, আর নিজে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার প্রকোপকে তুচ্ছ করে ঘুম-বিশ্রাম জয় করে লীন হয়ে গেছেন সাধুর সাধন পথের অন্তরালবর্তিনী সহ-যোগিনী রূপে। তবে যে সাধুবাবা বলেছিলেন 'অরণ্যের সাধনা আমার চেয়েও বড়ো'? দেখলাম। দেখে বুঝলাম—না বুঝলাম না, বোঝার চেষ্টাটুকুই মাত্র করলাম। সাত-সাতটা বছর মা আমার

এই পর্ণকুটিরে সাধনা করেছেন। এ অবস্থাতেও কিন্তু সব কাজই করেছেন। অর্থাৎ সকলের অগোচরে দিনের বাকি সময়টুকু তিনি ডুবে ছিলেন নিভৃত সাধনায়। সর্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিতা হওয়া কি সহজ কথা? নররূপে এলে নরলীলায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে যে! যাঁকে মহাশক্তিরূপে সকলকে শক্তি যোগাতে হবে তাঁকে শক্তি সংগ্রহের বিশ্বাসযোগ্য অনুষ্ঠান করতে হবে। নতুবা তিনি মা হবেন কী করে? হঠাৎই যদি শক্তিরূপে আবির্ভূতা হন তবে তো তিনি দেবী৷ তাঁকে পূজা করা যায়, ধ্যান করা যায়, ভালোবাসাও হয়ত যায়, কিন্তু ভালোবেসে তাঁর কাছে আবদার করা যাবে কী করে? যে দেবী বলেছিলেন, "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। / তদাতদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।" এত যাঁর ক্ষমতা, তাঁকেও আবির্ভূতা হবার পরেও কাত্যায়নগৃহে অবস্থান করতে হয়েছিল কেন? দেবতাদের বীর্যের সমন্বয়ে যে অলজ্জ্বৎবীর্যার আবির্ভাব তিনি তো আবির্ভাবের লগ্নেই অসুর-নিধনে প্রবৃত্ত হবার সামর্থ রাখেন। তবে? এই তবের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, তাঁকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন দেবতারা বলেই তিনি শুনিয়েছিলেন পরম আশ্বাস বাণী, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ও ভরসার স্থল — "যদা যদা বাধা ইত্থ্যা..."। এই ভালোবাসা অর্জন করতে হয়। সম্ভ্রম আদায় করা সহজ, ভালোবাসা অর্জন করা কঠিন। আর এই ভালোবাসাটুকু অর্জন করার জন্যই অবতার পুরুষ এবং লোকমাতাদের এত পরীক্ষা দিতে হয়। সাধুবাবাও তো বলছেন, 'পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি।' সাত সাতটি বছর মানুষের চোখের আড়ালে এই শক্তি অর্জনের সাধনা শুধু যে মাকে সাধুবাবার চেয়েও (সাধুবাবার কথায়) উচ্চতর সাধনার স্তরে অবরূঢ়া করেছিল তা-ই নয়, আশ্রয় প্রার্থীরা বুঝেছিল: "বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্। / বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১/৩৩)" (বিশ্বেশ্বরি তুমি বিশ্ব-পালিনী, বিশ্বরূপা তুমি বিশ্ব ধারয়িত্রী; তুমি মা জগৎ পিতারও অভিবন্দনীয়া। তোমার কাছে ভক্তিপ্রণত যারা, তারাই হয় সকলের আশ্রয়স্বরূপ।)

(ক্রমশঃ)

মহাভারতের শাশ্বত কথা

শ্রীদেবব্রত দাশ (সাহিত্য শেখর)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মহাভারতের অন্তর্গত—গীতার বিষয় বিগত দু'টি সংখ্যা ধরে আমাদের আলোচনা চলছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা আমরা জেনেছি, মানুষের জীবনে কর্ম্মের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কর্মটি হতে হবে নিষ্কাম। এটি বেদান্তেরও কথা। গীতা বেদান্তেরই ব্যবহারিক প্রয়োগ। মহাভারত যার দৃষ্টান্ত। যে শিক্ষা আমরা গীতার থেকে পাই তা হলো, ফলাফল যাই হোক, আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতেই হবে। লড়াই বা সংগ্রাম যাই বলুন, থামানো চলবে না।

এমন কি সফলতা এলেও, ভবিষ্যতে আরো সাফল্য লাভের জন্য এবং নিরন্তর সংগ্রামই মানুষের তপস্যা। যাঁরা নিজেদেরকে নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় সর্বদাই নিরত, তাঁরা তপস্বী তাপ সহ্য করে করে আপন লক্ষ্যের অভিমুখে তাঁরা অতন্দ্র পথযাত্রী।

সংগ্রাম কিন্তু চলবেই—। বাহ্য জগতে আমাদের যে সাফল্য আসে তারচেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্জগতে, চরিত্রে এবং ব্যক্তিত্বে যে বিশাল পরিবর্তন, যে শক্তি, যে ক্ষমতা আমরা লাভ করি। নিরন্তর সংগ্রামে আমাদের মানসিক জগতে বিরাট পরিবর্তন আসে। চরিত্রে, ব্যক্তিত্বে তো বটেই আমাদের দৃষ্টির চেতনার সর্বোপরি আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। এটা মনে রাখতে হবে, এই যে সংগ্রাম বা তপস্যা, তাতে সিদ্ধি'র মাত্রা কখনোই এক হবে না। ফলাফল অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। সিদ্ধি বা সফলতার জন্যই সংগ্রাম বা তপস্যা নয়। তপস্যা করে যেতেই হবে, তাতে যাই লাভ হোক না কেন। এটাই সত্য। কর্ম তপস্যা—নিজেই নিজের পুরস্কার। তপস্যা বা কর্ম যে করতে পারছি এটাই পুরস্কার, বাইরের অন্য কোন পারিতোষিকের প্রয়োজন নেই। যদি আসে সেটি উপরি পাওনা। সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে, সচেতন ভাবে কর্মরূপ তপস্যা নিখুঁত ভাবে করতে পারছি কিনা! সামান্যতম ছোট বা অতি নগণ্য কাজটিও যেন অনবদ্য ভাবে সম্পাদন করতে পারি। কাজটি করতে পারলেই, সেটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হলেই জানব যে আমি পুরস্কার লাভ করেছি। বাইরের যে কোন পুরস্কার, বাহবা—সবই, সর্বদাই এর কাছে অকিঞ্চিৎকর এবং মিথ্যা এমন কি আমাদের উদ্যমের পক্ষে বাধাস্বরূপ। সেজন্য যথার্থ কর্ম্মতপস্বীরা এসব পারিতোষিককে 'শূকরের বিষ্ঠা'—প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা জ্ঞানে বর্জন করে থাকেন। কর্মের আনন্দেই তাঁরা কর্মভার নির্বাহ করেন। কোন প্রকার সুনাম, প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। যে কোন প্রতিষ্ঠার চেয়েও কর্মের মহিমা অনেক বেশি। উপায়ের প্রতি যত্নবান হলে সিদ্ধি আপন হতেই করায়ত্ত হয়। মানুষের হাতে শুধু প্রচেষ্টা করারই ক্ষমতা রয়েছে। আর সেটাই শুধু আমরা করতে পারি। সেই চেষ্টা যেন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, কোথাও কোন ফাঁকি কিংবা অহংকার যেন না থাকে। সাফল্য আসবে কি না আসবে সে কথা ভাবার কোন প্রয়োজন নেই।

গীতা সেজন্য আমাদের মনে করে দিচ্ছেন——ফলের আসা করে কোন কাজ করবে না। ফলে তোমার অধিকার নেই। তোমার হাতে রয়েছে শুধু তোমার কর্ম করার অধিকার। প্রাণপণ চেষ্টা করে যদি ব্যর্থতা আসে, তাতেও হতাশ হবার কিছু নেই। আবার চেষ্টা করতে হবে। নিরন্তর প্রচেষ্টায় আমাদের অন্তরের ঘুমন্ত শক্তিগুলি'আপনা হতে জেগে উঠবে। এই যে সুপ্ত শক্তির জাগরণ—তা যে কোন পুরস্কারের চেয়ে হাজার গুণ বেশি দামী। এই চর্চায় আমাদের চিন্তাশক্তি, বিবেচনা-বোধ, দৃষ্টিশক্তি সাহস, মানসিক গঠন এবং ব্যক্তিত্ব এমন এক উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে যার ফলে প্রতিটি মানুষই সর্বাঙ্গীণ, সম্পূর্ণ হয়ে অজর, অভয়, অশোক হয়ে উঠবে। প্রত্যেকেই যথার্থভাবেই মানুষ হয়ে উঠবে। সংসারে কোন পুরস্কার এর সাথে তুলনীয়?

পৃথিবীতে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতার জনপ্রিয়তার কারণটিও ঠিক এইখানে। গীতার এই শিক্ষা—যা মুমূর্ষু মানুষকে তুলে ধরে আবার হাঁটতে শেখায়। গভীরতম হতাশা হতে তা মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ম্রিয়মানকে জাগরিত করে আনন্দলোকে। যে মানুষ মনে করে তার আর কোন আশা নেই, সব শেষ হয়ে গেছে, তাকেও প্রাণবন্ত করে, বিশ্বাসী করে, উদ্যমী করে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। গীতা সর্বধর্মের মানুষকে নিজধর্মের সারসত্য জেনে আরো ভালো করে সেই ধর্মের অনুসারী করে তোলে। প্রত্যেক বৃত্তির মানুষকে নিজের বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। প্রতিটি মানুষকে আপন সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তোলে। গীতাকে এই কারণেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজের অন্তরতম সম্পদ বলে দাবী করতে পারে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য এই পৃথিবীতে আর এমন একটিও স্মৃতি গ্রন্থ নেই যা গীতার সাথে তুলনীয়।

ইতালীর বিখ্যাত মিলান ইউনিভার্সিটির আহ্বানে গতবছর আমার রোমে যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আলোচনার বিষয় ছিল—'Ethics on Mahabharat'—মহাভারতের নীতি দর্শন। আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করেছি মহাভারতের দর্শন যে গীতা—এই কথাটি ওখানে উপস্থিত সবাই জানেন। প্রত্যেকেই গীতার মূল-তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। শুধু তাই নয়, রোমান এবং আধুনিক ইতালীয় ভাষায় পাঁচ - ছয়টি গীতার ভাষ্য ছাড়াও বহু জনের লেখা গীতার ওপর বিভিন্ন আলোচনামূলক গ্রন্থও সেখানে দেখেছি। এটাই গীতার জনপ্রিয়তা। ইতালির বহু শিক্ষিত মানুষেরা গীতার সাথে পরিচিত। ইতালীর সব কটি প্রাচ্য বিদ্যা কেন্দ্রেই গীতার ওপর চমৎকার কাজ চলেছে। কর্মোপলক্ষে—ইউরোপ - এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আমাকে যেতে হয়। বিশেষকরে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো বটেই—অষ্ট্রেলিয়ায় সিডনীতে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গীতার ওপর নানান্ গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে, দেখে এসেছি। জার্মানীতে সংস্কৃত চর্চা ব্যাপক। ফ্রাঙ্কফুটের বড় বড় পুস্তক প্রতিষ্ঠানে গীতার বিভিন্ন ভাষ্য - রচনা—নানান্ ইউরোপীয় ভাষায় বিক্রী হতে দেখেছি। আমাদের বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া, ইতালী, আমেরিকা, আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে গীতার প্রচার করছেন। গীতা ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়ের চর্চা এবং প্রচার এ সব প্রতিষ্ঠান করেন, তবে গীতার প্রচার এবং তার জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। যেখানে ভারতীয় কোন প্রতিষ্ঠান পৌঁছয় নি, সেখানেও গীতার পরিচয় এবং জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই জনপ্রিয়তার মূলে অবশ্যই গীতার শিক্ষা। যা গীতাকে সার্বজনীন করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষ গীতার মর্ম উপলব্ধি করেই তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে অন্বিত করে আত্মীকরণ করছে।

আমরা জানি সঙ্কট কালেই মানুষের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ এবং অনুকূল অবস্থায় সবাই চলতে পারেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন তাড়া করে বেড়ায়, বিপর্যস্ত করে তোলে, সেই প্রতিকূল পরিবেশে যে নিজের অনুকূলে ভাগ্যকে ফেরাতে পারে সেই যথার্থ বীর। বিরুদ্ধ হাওয়ার গতিকে

নিজের অনুকূলে ফিরিয়ে আনাই সব চাইতে বড় মুন্সীয়ানা। আমাদের সনাতন ধর্ম এই কথাই বলে যে, মানুষের মধ্যে এমন মানসিক ও চারিত্রিক শক্তির বিকাশ সম্ভব, যার দ্বারা মানুষ অন্তর এবং বাহির উভয় ক্ষেত্রের বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাস্ত করে আপন লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারে। গীতার ভাষায় তাঁকেই যোগী এবং তাঁর দক্ষতাকে - কর্ম কৌশল বলা হয়েছে—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন এবং সমত্ববুদ্ধিতে যোগযুক্ত হয়ে কর্ম্মসাধন যিনি করতে পারেন তিনিই যোগী, তিনিই আত্মতৃপ্ত এবং মুক্ত পুরুষ। তাঁরা জীবনকে সহজভাবে নিতে পারেন বলেই সব অবস্থায় অবিচলিত থাকেন। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেন না, নিজের চেষ্টার ওপর নির্ভর করেন। তিনি বিপদ দেখলে সরে যান না, বিঘ্ন বিপদকে স্বাগত জানিয়েই আত্মবিশ্বাসে ভর করে তার মোকাবিলা করে ধ্রুব লক্ষ্য পথে এগিয়ে যান। মনে রাখতে হবে—সঙ্কটে পিছু হটা নয়, বীরের মতো মোকাবিলা করাই—গীতার শিক্ষা।

গীতার আর একটি শিক্ষা অবশ্যই আত্ম-সহায়তা। নিজেই নিজের চালক হও। নিজেই নিজের প্রভু হও। বুদ্ধদেব যেমন বলেছেন—আত্মদীপা ভব। আত্ম সহায়তাই শ্রেষ্ঠ সহায়তা, এর চেয়ে বড় আর কোন অবলম্বনই হতে পারে না। ছোট চারাগাছকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে, সেই গাছ যখন নিজের ওপর নির্ভর করে ডাল-পালা - পাতা - শাখা প্রশাখা মেলে দেয় তখন সে বহু জনের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তার গোড়ায় হাতীও বেঁধে রাখা যায়। তেমনি যে মানুষ নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে ওঠে, সেই মানুষ বহু জনের আশ্রয়স্থল; অনেকেই তার ওপর নির্ভর করতে পারেন। আত্মসহায়তা যে বিশাল সম্পদ মানুষকে দান করে, তা তুলনাহীন। প্রবলইচ্ছাশক্তি এবং প্রচণ্ড আত্ম বিশ্বাস এ দুটি সেই মানুষের মধ্যে দেখা যায়, যিনি স্বচেষ্টায় বড় হয়ে উঠেছেন। বাধাবিঘ্ন জীবনে থাকবেই। বাধা বিঘ্নের মুখে বহু মানুষ খড়কুটোর মতো ভেসে যায় এও দেখা যায়। কিন্তু ঐ বিশেষ গুণ দুটি যার মধ্যে রয়েছে সে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন। কঠোর পরিশ্রম, মেধা, ধৈর্য, ইচ্ছা এবং আত্মবিশ্বাস—মূলধন করে সর্বপ্রকার বিঘ্ন অপগত করে, কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ঈপ্সিত সাফল্য মানুষ ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। সে যে নিজের ভাগ্যেরই রূপকার। মানুষের এই অন্তর্জাত শক্তির কথা একদিকে যেমন গীতায় বলা হয়েছে তেমনি এই শক্তিকে উজ্জিয়ে তোলার জন্য প্রতিটি মানুষকেই গীতা প্রবোধিত করে চলেছেন।

গীতার সবচাইতে বড়শিক্ষা অবশ্যই অনাসক্তি যোগের শিক্ষা। অন্যের দুঃখে কষ্টে যে দুঃখিত হয় না, অন্যের সুখে যে সুখী হয় না—সে স্বার্থপর। অনাসক্তি - আসক্তিহীনতা, কিন্তু কোন ভাবেই স্বার্থপরতা নয়। আমরা আগেই জেনেছি মানুষের জীবনে বাধা বিঘ্ন আসবেই, দুঃখ বিপর্যয়, শোক, মৃত্যু, ক্ষতি আসবে। এসবই অনিবার্য, কোনভাবেই রোধ করা যাবে না। মানুষ না চাইলেও এ সবই ঘটবে। এখন প্রশ্ন, মানুষ কি করবে? গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আচার্য রূপে বলছেন, — সহজভাবে সত্যকে মেনে নাও, এর দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত হয়ো না। সাক্ষীর মতো নির্লিপ্তভাবে দেখে যাওয়াই একমাত্র কাজ।

ভাল বা প্রেয় বস্তু আমাদের সহজেই আপ্লুত করে। ঠিক তেমনি, অনভিপ্রেত—শোক তাপে আমরা বড়ই কাতর হয়ে পড়ি। সেজন্য এর কোনটিই আমাদের চাওয়ার বস্তু হতে পারে না। সোজা কথায় আমরা মনের ওপর প্রভুত্ব করব। মন যেন কখনোই আমাদের নিয়ন্ত্রণ না করে। যা শ্রেয়, তা যতই কঠোর হোক, অপ্রিয় হোক্ জীবনে যেন তাকে বরণ করতে দ্বিধা না করি। যা কর্তব্য, তা যেমনই হোক্, পালনে যেন আলস্য না আসে। কোন চপলতাই যেন আমাদের সত্যভ্রষ্ট না করে তোলে, অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে যেন ভয় না পাই।

মানুষ কি সুখ, আনন্দ, আরাম, প্রতিষ্ঠা, যশ এসব কখনোই কামনা করবে না? করতেই পারে, তবে সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, তার ফলাফল অর্থাৎ, সুখ, আরাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, মান, সম্পদ এই সবগুলির সাথে সাথে আর যা যা আসবে তাকেও যেন সে শান্ত মনে গ্রহণ করতে পারে। ভাল হলে হাত বাড়িয়ে নেব আর কষ্টের বেলায় অন্য কিছুর দোহাই দেব, এ চলতে পারে না। যাই হোক্ না কেন, যেমনই আসুক না কেন—প্রতিটি অবস্থাকেই শান্ত মনে, অবিচল ভাবে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই অনাসক্তির শিক্ষাই গীতার মূল শিক্ষা। ভালো কিংবা মন্দ, নিন্দা এবং স্তুতি, মান অথবা অপমান, লাভ-ক্ষতি, আনন্দ বা শোক যাই হোক্ না কেন সব কিছুকেই সমান ভাবে উপেক্ষা করার কথা গীতায় বলা হয়েছে। যে মানুষ মানসিক ভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী, সেই মানুষই অনাসক্তি যোগের অধিকারী। সে মানুষই বীরের মতো সব কিছুকেই উপেক্ষা করে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে। যে বীর সেই ভক্ত। দুর্বল কখনোই ভক্ত হতে পারে না। ভক্তি—দুর্বলের লক্ষণ নয়, কাপুরুষের লক্ষণ নয়। গীতার দর্শন কখনোই জীবন সংগ্রামে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার কথা বলে না। বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে বলে না। অদৃষ্টবাদ বা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে পড়ে পড়ে মার খাবার কথা বলে না। বরং নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেবার কথাই বলে—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মা'দুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়॥

গীতার মতে, জীবন যেমন একটা অগ্নি পরীক্ষা তেমনি আবার অনন্ত সুযোগের উৎস। জীবন হতে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। যেমনই হোক্ তার সাধনা করতে হয়। জীবন আমাদের সামনে যে সুযোগ উপস্থাপন করে তা গ্রহণ করতে হলে লড়তে হবে, পিছু হটলে, ভয় পেলে চলবে না। প্রচণ্ড কর্মের মধ্যেও নিবিড়তম প্রশান্তির আশ্বাস—গীতার অন্যতম আদর্শ। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন পর্যালোচনা করলে এই শিক্ষাদর্শের যথার্থতা বুঝতে পারি। পরিস্থিতির ঊর্দ্ধে উঠে, সব অবস্থায় শান্ত এবং অবিচলিত থেকে, সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে স্বীয় নেতৃত্ব গুণে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তা শিক্ষনীয়। কর্তব্য সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের ধারণাটি সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর মতে প্রত্যেকের কর্তব্য আলাদা। শিক্ষাবিদের কর্তব্য আর যোদ্ধার কর্তব্য এক হবে না। যিনি শিক্ষাবিদ্ তিনি কাউকে হত্যা করবেন না কিন্তু যিনি যোদ্ধা প্রয়োজনে হত্যা করতে তিনি মোটেই দ্বিধা

করবেন না, কারণ, এটিই তার কর্তব্য। কেউ কারো নকলনবীশ হবে না আবার স্বধর্ম ত্যাগও করবে না। প্রত্যেক-কেই তার নিজের মতো করে, সামর্থ্যানুযায়ী লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। কর্তব্য পালনে উচ্চ নীচ বলে কিছু নেই। একজন ভালো সাফাই কর্মী এবং একজন নিষ্ঠাবান পূজারীর মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। কর্তব্যের বিচারে দু'জনেই সমান।

শ্রীকৃষ্ণ নতুন কিছু বলেন নি। সনাতন প্রজ্ঞাকেই তিনি নতুনভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন যুগোপযোগী করে। তাঁর আদর্শই গীতার আদর্শ। গীতায় তিনি মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি এবং কিভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, তার কথাই বলেছেন॥

(ক্রমশঃ)

কান্ত কবি শান্ত কেন

শ্রীঅরুণ কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কাশীধামের মানুষজন কান্তকবিকে সহজে ছাড়তে চাননি। তাঁরা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। বাংলা একুশে মাঘ তারিখে কলকাতায় সার্পেন্টাইন লেনের বাসায় কান্ত কবি ফিরে এলেন। কলকাতার সেরা সেরা কবিরাজরা তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু বেদনা কমল না। জ্বর কমল না, রোগ কমল না। কবির শ্বাসকষ্ট বাড়ল। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, কবিরাজী সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হল। আর কান্তকবি কখনও শুয়ে, কখনও বসে। কখনও ছুটে যন্ত্রণা কমাবার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি এতটুকু আরাম পান না। মনে হয়, এই বোধ হয়, প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ডাক্তার বার্ড সাহেবকে নিয়ে এলেন। বার্ড সাহেব পরীক্ষা করে বললেন, অস্ত্র সাহায্যে গলায় ফুটো করে রবারের নল বসাতে হবে। সেই নল দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা যাবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

তিন দিন দিনরাত মর্মান্তিক কষ্ট ভোগ করে আটাশে মাঘ রজনীকান্ত স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়দের ডেকে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দিলেন। কান্তকবি কোন রকমে স্বাক্ষর করেছিলেন।

যন্ত্রণা দূর করবার জন্য অক্সিজেন দেওয়া হল। কিন্তু কোন উপকার হল না। তাঁর গলায় অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আত্মীয়রা অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে মেডিকেল কলেজে গেলেন।

দেবদুর্লভ কণ্ঠের অধিকারী সুগায়ক, সুকবির গলায় অস্ত্রোপচার হবে। এ কথা ভাবলেই সারা দেহ মন এক অজানা আতংকে শিউরে ওঠে। কিন্তু আর ভাবার সময় নেই। দেরী করলে চলবে না, অস্ত্রোপচার করলে কবি বেঁচে যাবেন। মানুষ আশায় বুক বেঁধে বেঁচে থাকতে চায়। লোকেরা জেনেই গেল, কবি আর গাইতে পারবেন না। কবির গলা দিয়ে সুরেলা কণ্ঠের গান আর পরিবেশিত হবে না।

ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মেডিকেল কলেজে অস্ত্রোপচারের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। কবিকে গাড়ীতে তোলা হল, গাড়ীর মধ্যে কবিকে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা হল। কবির অসুখ কঠিন। গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে থাকে। হাসপাতালের তিন তলায় অপারেশন থিয়েটারে কবিকে নিয়ে যাওয়া হল। সেদিনের তারিখ ২৮শে মাঘ। বৃহস্পতিবার। কাপ্তেন ডেন্‌হ্যাম হোয়াইট সাহেব কান্তকবির গলায় অস্ত্রোপচার করলেন, এই অস্ত্রোপচারের নাম ট্রাকিওটমি অস্ত্রোপচার। প্রথমে সেই ছিদ্র দিয়ে ঝড়ের মত বেশ খানিকটা বাতাস, শ্লেষ্মা, রক্ত বেরিয়ে গেল। শ্বাস প্রশ্বাস চলাচলের জন্যে ছিদ্র পথে একটি রূপোর নল বসান হল। সাত আট দিন পরে রূপোর নল সরিয়ে রবারের নল বসান হয়। কবির জীবনরক্ষা হল কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা একেবারে চলে গেল। যে গলা দিয়ে মধু ঝরে পড়ত, যে গলা দিয়ে সঙ্গীতের সুধা ধারা অমৃতধারা বয়ে যেত, সব বন্ধ হয়ে গেল।

অনেকে বললেন, কবি প্রাণে ত বাঁচলেন। ডাক্তার মন্তব্য করেন, আর একটু দেরী হলে কবিকে বাঁচান যেত না। কবি আগে অল্প অল্প কথা বলতে পারতেন কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর তাঁর কথা বন্ধ হল। অপারেশান থিয়েটার থেকে তাঁকে যখন বাইরে আনা হল, কবি হাতের তালুতে লিখে জানালেন, ভয় নাই, বেঁচেছি।

কবি মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছিলেন। তাঁর গায়ে জ্বর ছিল কিন্তু তিনি অনেকটা ভাল বোধ করতে লাগলেন। কবিকে জেনারেল ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। হেমেন্দ্রনাথ বক্সী নামে মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। হেমেন্দ্রলাল কবির শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকতেন। কবি এক চিঠিতে লেখেন—এর নাম হেমেন্দ্রনাথ বক্সী। হেমেন্দ্রনাথ আমার টিকিট দেখে প্রশ্ন করে, আপনি রাজশাহীর উকীল রজনীবাবু? আমি বললাম, হ্যাঁ। হেমেন্দ্রনাথ বললেন, কোন ভয় নেই। যা করার আমরা করব। ভগবান যেন স্বয়ং হেমেন্দ্রনাথকে কান্তকবির কাছে পাঠালেন।

অস্ত্র চিকিৎসার তৃতীয় দিনে বাংলা ১৩১৬ সালের ৩০শে মাঘ শনিবার ১৯১৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাকে কটেজে নিয়ে যাওয়া হয়। মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন তিনখানা সুন্দর বাড়ী তৈরী করা হয়। এই তিনখানা বাড়ী কটেজ ওয়ার্ডস নামে পরিচিত। কান্তকবি ১২ নম্বর কটেজে থাকতেন। এই কটেজেই সাত মাস কাটিয়ে কান্তকবি জীবনলীলা শেষ করেন।

কান্তকবি ছিলেন পরিহাসরসিক কবি। তিনি হাস্যরস সৃষ্টিতে বাংলা কাব্যসাহিত্যে অদ্বিতীয়। কবি লিখলেন:

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা করে বসে আছি,—
পাব জীবনে, না হয় মরণে!
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকী-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে না লবে গো—
হয়ে পথের ধূলায় অন্ধ।
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে, পারে বসে, 'পার কর', বলে' পাপী
কেন ডাকে দীন শরণে?

কান্তকবির ছিল হাসিমুখ। তিনি মানুষকে যেমন হাসাতেন, নিজেও তেমনি হাসতেন! কিন্তু যে গলায় তাঁর রচিত বিভিন্ন গান গাওয়া হত, সেই সুকণ্ঠ চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। যিনি গানের পর গান লিখতেন, যিনি একটানা গান গাইতেন, তাঁরই সুরু হল নির্বাক জীবন। এই প্রসঙ্গে তিনি ২রা ফাল্গুন হেমেন্দ্রনাথ বক্সীকে লেখেন—তবু যা হোক, যে লোকটা 'লেখা' আবিষ্কার করেছিল, তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। নইলে আমার দশা কি হত। আর একটি চিঠিতে ৬ই ফাল্গুন কান্তকবি দুই কলেজের ছাত্রকে লেখেন—সকল মনের কথাই কি লিখে প্রকাশ করা যায়? এদিন তিনি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বলেন—দেখ সুরেন, আমার কথা বলবার শক্তি নাই, সব লিখে দেখাতে হয়। কি ভয়ানক পরিশ্রম আর অসুবিধে। একজন একটা কথা বলে গেলে তার জবাব দিতে আমার ১০ মিনিট। সুরেন্দ্রনাথ কান্তকবির সেবক।

কান্তকবির শেষ জীবন সুরু হল। তিনি দয়াল হরির উদ্দেশ্যে একদিন গেয়েছিলেন—

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি।
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে!
(আমি) সুখের মাঝে ভুলে থাকি তোমায়
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।

চার বছর পরে শ্রীহরি তাঁরই মুখ দিয়ে বললেন
আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে
গর্ব করিতে চূর।

প্রকৃতই দয়াল তাঁকে সকল রকমে কাঙ্গাল করতে ব্যস্ত। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব। জীবনটা শক্ত হয়েছে, কিন্তু দেবদুর্লভ কণ্ঠ আর শুনতে পাওয়া যাবে না। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান রজনীকান্ত ব্যাধিজালে জড়িত। তাঁকে অর্থ সাহায্য নিতে হয়েছে। দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায় কাশীতেই অর্থ সাহায্য করেন। তিনিই কান্তকবির হাসপাতালে কটেজে থাকার সব ব্যবস্থা করেছিলেন। বিধাতা নির্মম রসিক।

কান্তকবির বড় ছেলের বিয়ে। তাঁর রোগ তখন কঠিন আকার ধারণ করেছে। সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে। কান্তকবি বুঝতে পারছেন, তাঁর জীবনের খেলা শেষ হয়ে আসছে। এই মর্মান্তিক অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়ে। ঘটনাটা অস্বাভাবিক হলেও কান্তকবি একেবারেই আধুনিক মানুষ ছিলেন না। তিনি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী, তিনি উকীল। তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। বিয়ে তাঁর কাছে একটা ছেলেখেলা মাত্র ছিল না। পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্তব্য বলে মনে করতেন। কান্তকবি বেশ ভালভাবে জানতেন—

এ নহে দৈহিক ক্রিয়া, চিরবিনশ্বর
বিলাস-লালসায়-তৃপ্তি, এ নহে ক্ষণিক
মোহের বিজলীপ্রভা, নহে কভু সুখ—
দুঃখময় দুদিনের হরষ-ক্রন্দন—
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয়।

কান্তকবির কাছে সংসার ছিল আনন্দবাজার। সুখের হাট। আর পুত্রকে বোঝাতে হবে সংসার সুখের হাট। তাই তাকে সংসারী করতে হবে। তখন তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত। সারা দেহে অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা। ভাল করে খেতে পারেন না। অনাহারে দিন কাটে। এই মর্মান্তিক চরম অবস্থার মধ্যেও তিনি পুত্রের বিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। কান্তকবি বাল্যবিবাহ সমর্থন করতেন। ছেলে

উপার্জন করুক বা না করুক তিনি চাইতেন না বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আই.এ. পরীক্ষা দেয়ার পরেই বিয়ের কথাবার্তা চলতে থাকে। রাজশাহীতে বিখ্যাত জমিদার, তাঁর পরম স্নেহভাজন যাদব চন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা গিরীন্দ্র মোহিনীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হল।

কান্তকবি তখন রাজশাহীতে ওকালতী করছেন। তখন তিনি এই কালরোগে আক্রান্ত হন নি কিন্তু তাঁর ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। তিনি কালরোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁকে কাশী যেতে হল। সাময়িকভাবে বিয়ের কথাবার্তা বন্ধ হল। কাশীতে অস্ত্র রোগ যখন কঠিন, গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে, তিনি একটি টেলিগ্রাম পেলেন। এক আত্মীয় জানিয়েছেন, যাদবচন্দ্র মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। মেয়ে গিরীন্দ্রমোহিনীর বয়স হল চৌদ্দ বছর। যাদব বাবুর বড় ইচ্ছা, শ্রীমান শচীনের সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিয়েটা মিটে যাক। রজনীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে যাদবচন্দ্রকে জানালেন, তিনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। বিয়ের ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি হবে।

জীবনের বেলা শেষ হয়ে আসছে কান্তকবির বুঝতে দেরী হল না। তিনি হাসপাতালের কটেজে থেকে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। শচীনকে সংসারী দেখে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চান। তাঁর মনে হল, পুত্রবধূর আগমনে সংসারের অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে। আর স্ত্রী এক সঙ্গী পাবে।

বিয়ের দিন স্থির হল। কান্তকবির হাজারো অনুরোধ সত্ত্বেও তার স্ত্রী কান্তকবিকে ছেড়ে বিয়েতে গেলেন না। রজনীকান্ত কলকাতায় রইলেন। পাশে তাঁর সাধ্বী স্ত্রী। রাজশাহীতে বিয়ে হল। রজনীকান্তকে বহুবাজারের বাসায় আনা হল। শচীন বিয়ের পরদিনই নববধূকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এলেন। বাড়ীতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

কান্তকবি কটেজে ফিরতে চাইলেন না। তিনি বললেন, কুমার শরৎকুমার যে অর্থ সাহায্য দেন সেই টাকায় ভালভাবে বাসায় থাকতে পারবেন। কিন্তু ডাক্তাররা আপত্তি করলেন। বাসায় কোন চিকিৎসা হবে না। সকলের অনুরোধে বিশেষ করে কুমার শরৎকুমারের অনুরোধে তিনি কটেজে ফিরে গেলেন।

কান্তকবি রোজনামচায় লিখলেন, তুমি লক্ষ্মী, ঘরে এসেছ, তোমার পুণ্যে যদি বাঁচি। যত সুন্দরী বউ দেখি—তোমার মত ঠাণ্ডা, তোমার মত লজ্জাশীলা, তোমার মত বাধ্য কেউ নয়। সাদা চামড়ায় সুন্দর করে না, স্বভাবে সুন্দর করে। যে তোমাকে দেখে সেই তোমার প্রশংসা করে। এমনি প্রশংসা যেন চিরদিন থাকে। ভাল করে তোল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন সেরে উঠি।

ভগবান এখানে কালা, বোবা, অন্ধ। সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

কান্তকবি শুনলেন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বলতে থাকেন, তিনি নাকি পুত্রের বিয়েতে পণ নিয়েছেন। এমন কি এই কথাটা বিশিষ্ট সংবাদ পত্রের সম্পাদকের, সমাজ সমালোচকের কানে

উঠল। কান্তকবির এই আচরণের কথা বিশ্বাস করে মন্তব্য প্রকাশিত হল—এই রজনীকান্তই না 'বরের দর', 'বেহায়া বেহাই' নামে রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক কবিতা লিখেছিলেন? এই রজনীকান্তই না পণ গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সমাজ-শাসকরূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন? এই রজনীকান্তই না পণ-গ্রহণকারী পুত্রের পিতার দেহে পিঠে মধুর চাবুক মেরেছিলেন? এখন বোঝা গেল, রজনীকান্তের মুখে এক আর কাজে আর। এমন লোক বাংলার কলংক! কান্ত-কবির এই আচরণে সম্পাদক অবাক, মানুষ বিস্মিত।

কান্তকবি স্বয়ং তাঁর বৈবাহিককে লিখেছিলেন: দেখ একটা কথা বলি। আমার এই বাঙ্গালা দেশে যেটুকু সামান্য পরিচয় তা আমি ছেলের বিয়েতে টাকা নিয়ে প্রায় নষ্ট করেছি। শিক্ষিত সম্প্রদায় বলেছে—রজন বাবু মুখ হাসিয়েছেন, তা আমি না শুনতে পাচ্ছি এমন নয়। তবে আমি যে আজ এগার মাস জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে পড়ে ঘোর বিপদ-সাগরে ভাসছি—তা তোমার না জানা আছে তা নয়—নইলে টাকা নিতাম কিনা সন্দেহ।"

[ক্রমশঃ]

হৃষীকেশ-হরিদ্বার-বদরী-কেদার

—শিউলী দাস

আসমুদ্র হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে প্রচুর দর্শনীয় স্থান আছে, যা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ বেরিয়ে পড়ে। যদিও বাঙালী হল বেশী ভ্রমণ পিপাসু। প্রতি বছরের মত এবছর আমরাও বেড়াতে গিয়েছিলাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে। গত 18ই অক্টোবর 2007-এ বেরিয়ে পড়ি, ট্রেন ছিল রাত ১১টায় দেরাদুন এক্সপ্রেস। ট্রেনে উঠে দুটোরাত কাটিয়ে 20 তারিখে হরিদ্বার পৌঁছাই। ট্রেনটি আট ঘণ্টা late থাকায় বেলা ১২টায় হরিদ্বারে প্রবেশ করে। হরিদ্বারে ঢোকার সময় দূরে পাহাড়ের পরিবেশ যেন হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে। হরিদ্বারে প্রবেশ করার পর আমরা ভোলাগিরি ধরমশালার ঠিক বিপরীতে একটি হোটেল (লহরী) ভাড়া করি। তারপর স্নান করে এসে পাশে দাদা-বৌদির হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ে বিশ্রাম নি। ট্রেনের journey-তে ক্লান্ত হলেও হরিদ্বারে পৌঁছানোর পর সেই ক্লান্তিভাব যেন ধীরে ধীরে কেটে গেল। আমাদের tour ছিল 15 দিনের। দুদিন হরিদ্বারে stay করে সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার পর 22শে অক্টোবর হৃষীকেশে পৌঁছাই। এখানে পরমার্থ ভবনে গিয়ে উঠি। এর পাশেই নিঃশব্দে বয়ে চলেছে গঙ্গা। গঙ্গার বন্দন-আরতি দেখার জন্যই হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে। বিকাল হলে আরতি আর হোমের জন্য সবরকম আয়োজন হতে থাকে। তাছাড়াও এখানে সূর্যের অস্তগামী দৃশ্য উপভোগ করার মত। পরের দিন আমরা লছমন-ঝোলায় টাটাসুমোতে করে গিয়েছিলাম। যদিও পথের দূরত্ব বেশী নয়, হেঁটেও যাওয়া যাবে। এখানে আছে কিছু মন্দির আর রয়েছে দোকানপাট। হোটেলের পাশে পাহাড়ী দৃশ্য আর নদীর কলরব দেখতে দেখতে সময়ও (কখন কেটে যায় আর বোঝা

যায় না) নদীর মত বয়ে গেল, আর সবাই টাটা-সুমোতে উঠে হৃষীকেশে ফিরে এলাম।

হৃষিকেশ থেকে আমরা বদ্রীনাথ যাবার জন্যে সকাল 8 টায় টাটাসুমোতে উঠে পড়ি। হৃষীকেশ থেকে বদ্রীনাথের দূরত্ব প্রায় 200 km। হৃষীকেশ ছাড়ার পর পথের দুপাশের প্রকৃতি ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে। ভয়ঙ্কর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ এই পাহাড়ী পথ মনকে যেন অন্য জগতে নিয়ে প্রবেশ করল। যতই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি, ততই মন যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে থাকে। তুষার-ধবল পর্বতমালা, সবুজ পাহাড়ী অঞ্চলে নাম না জানা গ্রাম, নদীর স্রোতের কলরব, পাইন বনের নিঃশব্দ পরিবেশ হৃদয়ে এক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। পাহাড় আর নদী ছিল আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী। এই অপার সৌন্দর্যের মধ্যেও পাহাড় আর নদী মানুষের জীবন নিয়ে খেলার কথা ভাবতেও ইতঃস্তত বোধ করে না। যাবার পথে কিছু কিছু জায়গায় পাহাড়ের গাম্ভীর্য যেন বেশী করে ফুটে উঠেছে। পাহাড়ী পথগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে মনে হয় যেন একই পথে বারবার চলেছি, কখনও উপরে আবার কখনও নীচে নামছি —এখানে প্রকৃতি যেন ভিন্নরূপে রূপান্বিত হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির এই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে একসময় আমরা 1700 ফুট উচ্চতায় দেবপ্রয়াগের কাছে এসে পৌঁছাই। এখানে অলকানন্দা ভাগীরথীর সাথে এসে মিশেছে। দুই নদীর সবুজ স্বচ্ছ আর ঘোলাটে জলের সঙ্গমের দৃশ্য উপভোগ করার মত। পাকদণ্ডী থেকে নীচের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে সেই দৃশ্য—পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসা দুই নদী মিলেমিশে নীচে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গমের পাড়ে একটু উঁচুতে দেবপ্রয়াগ মন্দিরের শীর্ষদেশে বাতাসে উড়ছে রঙিনিশান। পাকদণ্ডীর একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে খাদের নীচে বয়ে যায় উচ্ছল অলকানন্দার দুগ্ধফেননিভ জলরাশি। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে গিয়ে পৌঁছাই রুদ্রপ্রয়াগে। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলের কাছেই রুদ্রপ্রয়াগ মন্দির অবস্থিত। সঙ্গমের জল ছুঁয়ে যায় এক শিলাখণ্ডকে। তার নাম নারদশিলা।

পুরাণ কথিত গাথানুযায়ী নারদমুনি ঐ শিলাখণ্ডে বসে সঙ্গীত সাধনা করতেন। রুদ্রপ্রয়াগ নামটি কানে যাবার সাথে সাথেই মনে পড়ে যায় শিকারী জিম করবেট ও তাঁর বিখ্যাত শিকার কাহিনী 'ম্যান ইটারস্ অব কুমায়ুন' অ্যাণ্ড 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অব রুদ্রপ্রয়াগ-এর কথা। রুদ্রপ্রয়াগ শহরে প্রবেশ করার 2 km আগে গুলাবরাই। রাস্তার পাশেই চোখে পড়ে শ্বেতপাথরের এক স্মারক আর সেই বিখ্যাত আমগাছটি—যে গাছের ডালে বসে করবেট সাহেব কুমায়ুন-গাড়োয়ালের ত্রাস সৃষ্টিকারী 125 জন মানুষ ভক্ষণকারী চিতাবাঘটিকে শিকার করেছিলেন। সেই ঘটনার পর আশি বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। অনেকে বলেন চিতাবাঘ এখনও নাকি রুদ্রপ্রয়াগ সংলগ্ন পাহাড়ী জঙ্গলে রয়েছে। মাঝে মাঝে তারা নাকি পাহাড়ী গ্রামে ঢুকে ছাগল, ভেড়া টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু মানুষের ওপর সচরাচর হামলা করে না।

রুদ্রপ্রয়াগ হল ছোট্ট পাহাড়ী শহর। মন্দাকিনী অলকানন্দার পাড় ঘেসে হোটেল, ধরমশালা, বাজার, প্রশাসনিক ভবন, স্কুল সবই আছে। জিম করবেটের

সময় একটিমাত্র সরাইখানা ছিল গুলাবরাইতে—যা ছিল এই শ্বাপদসঙ্কুল সেদিনের পথে তীর্থযাত্রীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে দুদিকে পথ চলে গেছে। বাঁদিকের পথ মন্দাকিনীর ধার ঘেঁসে চলে গেছে 85 km দূরে গৌরীকুণ্ডে অন্যপথ অলকানন্দার তীর ধরে এগিয়েছে 159 km দূরবর্তী বদ্রীনাথের দিকে। কেদার বা বদ্রীনাথের যাবার আগে আর একটি জিনিস দেখার রয়েছে—কোটেশ্বর গুহা। রুদ্রপ্রয়াগ বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে কোটেশ্বরের দূরত্ব 5 km। চোপতাগামী বাসে অথবা হেঁটে উপস্থিত হওয়া যায় কোটেশ্বরে। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে বেশ অনেকটা নীচে নেমে এই গুহা যা অতি সঙ্কীর্ণ। গুহার প্রবেশ মুখে বাতাসে ভেসে আসা ঝর্ণার জল শরীর ভিজিয়ে দেয়। এই স্যাঁতস্যাঁতে গুহার মধ্যে প্রদীপের আলোতে উদ্ভাসিত প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠা শিবলিঙ্গের আকৃতির বিচিত্র বর্ণের পাথর। এই শিবলিঙ্গ আকৃতির পাথরের সংখ্যা নাকি কোটি। তাই গুহার নামকরণ হয়েছে কোটেশ্বর। গুহার আরও একটু নীচে দেখা যায় মন্দাকিনীর জলপূর্ণ বিরাট কুণ্ড। পাহাড় আকৃতির বিরাট দুটি পাথরের মাঝখান দিয়ে জলধারা সেখানে এসে জমেছে। কুণ্ডের জল বরফ শীতল। পাহাড়ের উপরে সবুজ বৃক্ষের প্রতিবিম্ব কুণ্ডের জলে দেখা যায়। এই কোটেশ্বর আর কুণ্ডের চারপাশে এক আদিম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল যোশীমঠ। পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় দিনের আলো শেষ না হতেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চল। যার জন্য একদিনেই বদ্রীনাথে পৌঁছানো যায় না। বদ্রীনাথে যাওয়ার আগে রাতটা আমরা যোশীমঠে কাটাই। যোশীমঠ হল পাহাড়ী জনসমৃদ্ধ এলাকা। এখানে আমরা সন্ধ্যে 7টায় এসে পৌঁছাই। ভীষণ ঠাণ্ডা জায়গা। হোটেলে ঢুকে যাওয়ার পর আর যেন বাইরে বেরোতে ইচ্ছা করছিল না। তবে হোটেলের একটি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দায় দাঁড়াতেই শুনতে পেলাম নদীর স্রোতের বিরাট গর্জন। পাহাড়ের গায়ে রাতের বেলায় বাড়িগুলোও দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। আর সন্ধ্যে হতে না হতেই চারদিকে যেন এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। নেই কোনো মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি। হোটেলটির পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওখানকার স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে জানতে পারলাম হোটেলের পেছনে একটি রাস্তা রয়েছে। নভেম্বর শীতের প্রকোপ আরও বেশী হওয়ার জন্যে সাধারণ যে রাস্তাটা থাকে সেটি বরফে ঢেকে গেলে তখন ঐ রাস্তাটি ব্যবহার করা হয়। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ছিল অক্টোবর মাস। তখনই ছিল হাড়কাঁপুনি ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ভোরবেলা উঠে ওখানে কিছু মন্দির রয়েছে নীচের দিকে সেসব দর্শন করলাম। তারপর আমরা চা খেয়ে সকাল 6টায় টাটাসুমোতে চাপলাম বদ্রীনাথে যাবার জন্যে। যোশীমঠ থেকে বদ্রীর দূরত্ব 4 km। বদ্রী পর্যন্ত সমস্ত পথে অলকানন্দা পর্যটকদের সঙ্গ দেয়। এখানে যাবার পথটি একমুখী হওয়ায় সময় নিয়ে পালা করে গাড়ি আসা যাওয়া করে। বদ্রীনাথ যাবার পথে কিছু জায়গা রয়েছে ধসপ্রবণ, আবার কিছু জায়গা পাহাড়ের কোন অংশ এমনভাবে অবস্থান করছে, যা দেখে মনে হয় সেই মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। পথটি বিপজ্জনক হলেও অত্যন্ত মনোলোভী। নদী-পাহাড়ের সমাগম আর নীল

আকাশের কোলে মেঘের ছোটাছুটি, পাহাড়ের পাদদেশে সবুজে মোড়া প্রান্তর, রূপালী ফিতার মত বয়ে চলা নদী সবই যেন মনে হয় তুলিতে নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে। পাহাড়ের সবুজ বুগিয়ালে চরে বেড়ায় বন্য ঘোড়ার দল। আমাদের চলার পথেও গাড়ি করে যেতে যেতে দেখলাম একদল ভেড়াকে, কিছু ছাগলও রয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা নিয়ে চলেছে। রাস্তার মাঝপথে তারাও পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসছিল, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। যাবার পথে কোথাও আবার পাহাড়ী ঝর্ণার জল এসে রাস্তা ধুয়ে নীচে অলকানন্দার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি তখন পাহাড়ী ঝরণার পাশে এসে হাতে একটু জল নিয়ে খেলাম। মুখে দেবার সাথে সাথে মুখটা যেন তেতো হয়ে গেল। কিন্তু একটু জল নিয়ে বোতলে রেখে কিছু সময় পর খেয়ে দেখলাম সেই তেতো ভাবটা আর পেলাম না। হিমালয়ের এই অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা বদ্রীনাথে পৌঁছলাম। অলকানন্দার তীরে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে বদ্রীনাথের প্রাচীন মন্দির। তাঁর সামনে অলকানন্দার উপর রয়েছে লোহার সাঁকো। মন্দিরের নীচের দিকে রয়েছে দুটি কুণ্ড—একটি ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ আর একটি গরম জলের প্রস্রবণ। সবাইকে দেখলাম গরম জলের কুণ্ডে তারা স্নান করছে, কাপড় ধুচ্ছে, বদ্রীতে আরও বেশী ঠাণ্ডা। মন্দিরের উল্টোদিকে সাঁকোর এপারে দোকান বাজার, হোটেল আর ধরমশালায় জমজমাট। তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে এই এলাকা বেশ জমজমাট থাকে। বদ্রীনাথের উচ্চতা হল 3133 মিটার। অলকানন্দার দুই তীরে তুষারাবৃত দুটি পর্বত নর আর নারায়ণ, সেখান থেকে নীলকণ্ঠ শৃঙ্গকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখলে মন যেন আনন্দে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নিজে চোখে না দেখলে ভাবে প্রকাশ করা যায় না। এরপর আমরা একটি হোটেলে জলখাবার খেলাম। জিনিষের দাম এখানে প্রচুর। তারপর আমরা ঠিক করলাম মানাগ্রাম দেখার জন্য।

বদ্রীনাথ থেকে মানা গ্রামের দূরত্ব 4 km. এটি হল ভারতের শেষ গ্রাম। পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস এখানে। যতদূর শুনলাম ভুটিয়া সম্প্রদায়ের এখানে বেশী বসবাস করে। এখানকার লোকেদের জীবিকা পশুচারণ ও কার্পেট বোনা। পাথর দিয়ে তৈরী নীচু ছাদওয়ালা ঘরের দোরগোড়ায় বসে এখানকার মেয়েরা কার্পেট বোনে। কাছেই আছে ব্যাস নামে একটি গুহা আর জানতে পারলাম যে এই গুহাতে বসেই ব্যাসদেব নাকি তাঁর ষ্টেনোগ্রাফার গণেশকে মহাভারতের dictation দিতেন। এই গুহা দেখার জন্য আমরা শুধু নয়, বেশীর ভাগ লোকই যেতে চাইলেও যেতে পারেনি। কারণ গুহাটি দেখতে হলে 4km পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে, এর কোন বিকল্প রাস্তাও বোধ হয় নেই। পাহাড়ের ধাপ কেটে কেটে কিছু সিঁড়ি দেখতে পেলাম। কিছুদূর ওঠার পর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, তারপর আর গেলাম না—ফিরে চলে এলাম। মানা গ্রামে সরস্বতী নদী এসে অলকানন্দার সাথে মিশেছে। গ্রামটা ভালভাবে ঘুরে দেখা আর সম্ভব হয়নি। স্থানীয় লোকের সাথে কিছুটা সময় কথা বলে জানলাম সরস্বতী নদীর ওপর ভীমপুল পেরিয়ে আরও 5km পথ গেছে বসুধরা জলপ্রপাতের দিকে। এই পাহাড়ী পথ হল নির্জনতম। এপথে ঘোড়াও পাওয়া যায় না। কখনও পাশে রয়েছে

ঘনগাছের জঙ্গল, কখনও বা পথের ওপরে নেমে আসা গ্লেসিয়ার। চারপাশে হিমালয় পর্বত আকাশের বুকে আপন গাম্ভীর্য নিয়ে বিরাজ করছে। পথ অতিক্রম করার পর চোখে পড়বে বসুধরা জলপ্রপাত। পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে বাতাসের দোলায় দুলতে দুলতে ক্রমশ নীচে নামছে এই দুগ্ধফেননিভ বসুধরা। সম্পূর্ণভাবে নীচে নামার আগেই তার জলকণা মিশে যাচ্ছে বাতাসে। পটভূমিতে নীল আকাশের বুকে গিরিরাজ হিমালয়, পাদদেশে টিয়ারঙের জঙ্গল, জলপ্রপাতের শব্দ মিশে যাচ্ছে নিস্তব্ধতার সাথে। এ এক অনাস্বাদিত পৃথিবী বিরাজ করছে। গাড়োয়াল হিমালয় এখানে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে বোঝা গেল বসুধরা দেখারই মত।

গাড়োয়াল হিমালয়ের আরও এক স্বর্গীয় রূপ আছে। সেই রূপও ভয়ঙ্কর সুন্দর। এখানে যাবার জন্য হৃষীকেশ থেকে ধরাসু-উত্তরকাশী-গাঙনানী-ভৈরবঘাঁটি হয়ে গঙ্গোত্রীতে, সেখান থেকে পদব্রজে গঙ্গার উৎসমুখ গোমুখে। Travel agencyতে যখন গাড়ির জন্য গেলাম এবং কোথায় কোথায় যাবো প্রোগ্রাম করার সময় তারা গঙ্গোত্রীর বর্ণনা দিয়ে ঘুরে আসার জন্যও বলেছিল। কিন্তু এই অপূর্ব স্বর্গীয় শোভা বিরাজিত জায়গায় আর যাওয়া হয়নি।

আমরা বদ্রীনাথ ট্যুর করে আবার হরিদ্বারেই ফিরে আসি। বদ্রীনাথ থেকে হরিদ্বারে ফিরে আসবার পাহাড়ী পথটিও অপূর্ব ছিল। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ী বাড়ীগুলোতে লাইট জ্বলে উঠছে আর যত ওপর থেকে নীচের বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আকাশে যেন তারার মিটি মিটি দৃশ্য। পাহাড়ের যে জায়গায় ঘনঘন বাড়ী অবস্থান করছে, সেখানে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। আবার কিছু জায়গায় বাড়ীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় মনে হয় যেন আকাশে তারাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে রাত ৪টায় শ্রীনগর এসে পৌঁছাই, সেখানে আমরা হোটেল ভাড়া করে রাতটা কাটাই, তারপর ভোর হবার সাথে সাথেই টাটাসুমোতে জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ি। বেলা প্রায় ১১ টা যখন, তখন হরিদ্বারে এসে পৌঁছাই। তারপর হোটেল ভাড়া নিয়ে আর বাকী চারদিন এখানেই আনন্দে কাটিয়েছি। যাবার দিন যত এগিয়ে আসল আমার তো ভীষণ মন খারাপ লাগতো, মনে হত যেন আর কদিন থেকে যাই, কিন্তু থাকা আর হল না। পরদিন ১লা নভেম্বর বেলা ১২ টায় উপাসনা ট্রেন ছিল। যাবার দিন আমরা সবাই ভোর ভোর উঠে স্নান করে হরকি পৈরি ঘাটে গিয়ে সব মন্দির দর্শন করলাম। দর্শন করে ফিরে আসার সময় এত সুন্দর একটা পরিবেশ থেকে যেতে আমার কান্নাই পাচ্ছিল। হঠাৎ যেন মনে হল এখানেই হারিয়ে যাই, যাতে যাবার Plan-টাও ভেস্তে যায়। যাইহোক, হোটেলে ফিরে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে এক এক করে নীচে নামাতে থাকলাম। তারপর 10 টায় দাদা - বৌদির হোটেলে খাওয়া - দাওয়া করে একটি গাড়ি আমরা ভাড়া করে Station-এ নিয়ে যাই। প্রায় এক ঘন্টা আমরা হরিদ্বার ষ্টেশনে বসে রইলাম। কিন্তু 12 টা বাজলেও ট্রেন এসে তখনও পৌঁছায়নি। বেলা 1-30 টায় ট্রেন আসল, তার আগে আমরা

কুলি ঠিক করি, সে সব জিনিস ট্রেনে তুলে দিল, আমরাও ট্রেনে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরই ট্রেনটি হাওড়ার দিকে রওনা দিল। আমরা ট্রেনে (উপাসনা) উঠেছিলাম ১লা নভেম্বর আর পরের দিন ২রা নভেম্বর কলকাতায় এসে পৌঁছাই।

এই সময় আমার মনে পড়ছিল একটি গানের কথা—

"এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে উড়ুক না রে
মেলে দিয়ে গানের পাখনা"

এই ঘোরার স্মৃতি আমার সারাজীবন মনে থাকবে।

শিমুলতলা শ্রীতারামঠে সাধুবাবা শ্রীশ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেব ও সাধুমাতা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর স্মরণোৎসব—২০০৮

বিগত পঁচিশে ডিসেম্বর ২০০৮ শিমুলতলা শ্রীতারামঠ প্রাঙ্গণে সাধুবাবা শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব ও সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর স্মরণোৎসব উদযাপিত হয়। কোলকাতা থেকে বহু ভক্ত উৎসব পালনের জন্য শিমুলতলায় উপস্থিত ছিলেন। সকাল থেকেই পূজা আরাত্রিক হোম ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসব সূচিত হয়। মধ্যাহ্নের ভক্ত সেবা, নর-নারায়ণ সেবার অন্নযজ্ঞ চলে অপরাহ্ণ পর্যন্ত। সায়াহ্নে সঙ্গীত এবং আলোচনার মাধ্যমে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সঞ্চালনা করেন শ্রীআশিস সেনগুপ্ত। সভার উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅর্দ্ধেন্দু দাশগুপ্ত—'জয়গুরু জয়গুরু ব'লে যাত্রা সুরু কর-সকল কাজের আগে গুরুর চরণ যুগল ধর। এরপর মাল্যদান ক'রে সভানেত্রী পদে বরণ করা হয় শ্রীমতী অপর্ণা দাশকে প্রধান অতিথি পদে বৃত হন শ্রীগৌরাঙ্গ মহারাজ।

অসুস্থতার কারণে প্রারম্ভিক ভাষণ দান করেন গৌরাঙ্গ মহারাজ। তিনি বলেন দেহ, প্রাণ, মন এই তিন নিয়ে জীবসত্তা—পশু, পাখী, মানুষ সকলেরই এই তিন সত্তায় অধিষ্ঠান। তবু বহু জন্মের পর পশুর স্তর থেকে মানুষ মনুষ্যত্বে উপনীত হয়েছে। বিচারশীল হয়েছে, বিবেকবান হয়েছে। তবুও ক্ষুদ্র মানুষ মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বসে বৃহৎ মানুষে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে সবায়ের সাথে মিশতে পারলে ক্ষুদ্র মানুষ বৃহৎ মানুষে পরিণত হয়। তপস্যা মানে তাপ সৃষ্টি করা—শরীর এবং মন তাপদগ্ধ হ'লে তপস্যা করা হয়। কাউকে নিন্দা করলে নয় ভালবাসায় সব কিছু একাকার করে দিলে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ হয়।

এরপর শ্রীমতী গোপা গুপ্তের সঙ্গীত—কোথা আছ প্রভু এসেছি দীন হীন, আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।

এরপর ভাষণ দেন জনার্দ্দন সিংজী। সিংজী কেমনভাবে আশ্রমে এলেন, কি ভাবে আশ্রমের সাথে জড়িয়ে পড়লেন সেসব কথা বলেন। '৮৩ সাল থেকে নিয়মিত আশ্রমে আসা যাওয়া সুরু হয়। যাতায়াত করতে করতেই সাধুবাবা সাধুমার

ওপর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। সাধুবাবা সাধুমার কৃপা পাওয়া সুরু হয়।

এরপর দুটি হিন্দী ভজন গান করেন শ্রীমতী অনুরাধা মিশ্র। তারপর কাজী নজরুল ইসলামের ফরিয়াদ থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন শ্রীআশিস সেনগুপ্ত তারপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র—যো এক নীর হ্যায় গঙ্গাজী এক নাম হ্যায় রাম···ছোট্ট মেয়ে মধু মিশ্র এরপর একটি গান শোনায়। তারপর সুমধুর কণ্ঠে ভজন পরিবেশন করেন শ্রীমতী অনুরাধা গোস্বামী পায়োজী ম্যায়নে রামরতন ধন পায়ো—

গানের পর ভাষণ দেন প্রভু নারায়ণ মিশ্র মহাশয়। তিনি বলেন বাংলা বলতে না পারলেও হিন্দীতে বক্তব্য পেশ করতে অনুমতি দেবার জন্য ধন্যবাদ। গৌরাঙ্গ মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হবার পর সাধুবাবা সাধুমা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তাঁদের কৃপায় আমার চাকরী হয়েছে, চাকরী পাকাও হ'য়ে গিয়েছে। নানা ভাবে করুণা পেয়ে সাধুবাবা সাধুমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসও অনেক বেড়ে গিয়েছে।

পরবর্ত্তী সঙ্গীত "মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে"—পরিবেশন করেন শ্রীমতী অনুরাধা সিং।

এরপর ভাষণ দেন সুনন্দা সান্যাল। সাধুবাবা ও সাধুমাকে প্রণাম জানিয়ে তিনি বলেন যে সাধুবাবাকে দূর থেকে দেখলেই বোঝা যেত তিনি একজন দিব্য পুরুষ। তিনি সামান্য কিছু আহার করেও গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে তুলে দিয়েছেন। সাধনাকালে বিষ্ঠা মুখে দিয়ে সাধনা করে জনসমক্ষে এলে মানুষ চন্দনের গন্ধ পেয়েছে। বিপরীত ক্রমে সাধুমাকে অতি সাধারণ মানুষের মতই জীবন ধারণ করতেই দেখা গেছে। তাঁর সাধনা জীবন কেউ দেখেনি। এমন কি শ্রীসাধুবাবার সংগে বিবাহের আগেই সাধুমার অলৌকিক ঐশ্বর্য দেখা গেছে। নিস্তরঙ্গ হালদা নদী দিয়ে পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে আসার পথে অকস্মাৎ, উল্টে গেল নৌকা—উল্টানো নৌকার গলুই এর ওপর নির্বিকার বসে রইলেন পনের বছরের অরণ্যকুমারী। মা আমাদের জন্মসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা। মা মাতঙ্গিনী দেবী আপত্তি জানাচ্ছেন তারা পাগলার সঙ্গে বিয়েতে—ছোট্ট অরণ্যকুমারী বলছেন আমার কপালে যা আছে, তাই হবে। বিয়ের পর সাধুবাবা কাটারী হাতে উন্মত্তবৎ ছুটে এসেছেন কোথায় সেই বজ্জাতিনী? মাকে লুকিয়ে রাখা হোল কাঠের সিন্দুকে।—মার কোনও বিকার নেই, বিরক্তি নেই, প্রতিবাদ নেই। বারবার পরীক্ষা দিচ্ছেন, উত্তীর্ণা হচ্ছেন। সাধুবাবার ভক্তেরা জিগ্যেস করছেন আপনার পর আশ্রম কে চালাবে? বাবা নির্দ্দেশ দিচ্ছেন কেন অরণ্য চালাবে। সে দায়িত্ব অরণ্যকুমারী ত' তার কত আগে থেকেই পালন করছিলেন। বাবার ১৯২৮ থেকেই বারবার কোলকাতা যাতায়াত চলছিল। ১৯৩৪ সালে পাকাপাকি ভাবে কোলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকা সুরু হোল। এর অনেক আগেই সাধুর জন্মস্থান চট্টগ্রামের গুজরা গ্রামে তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের শ্মশানের ওপর স্থাপিত হয়েছে কৈলাসেশ্বরী কালী। মাতার নামে সাধু প্রতিষ্ঠা করেছেন অমলেশ্বর শিব। সে সকল মন্দিরের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন অরণ্যকুমারী, সাধুবাবার গুজরায় অনুপস্থিতিতে, স্বেচ্ছায় বহু আগে থেকেই। দৈবীশক্তির আধারভূতা হয়েও মা ছিলেন প্রচ্ছন্না– নিজের অপরিসীম ক্ষমতাকে

সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি দিয়ে। রাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ এসেছিলেন এস. আর. দাশ রোডে মায়ের কাছে। রাজা তাই কি? সন্তান বৈ ত' নয়!—মা এলেন গুল দিতে দিতে, হাত ধুয়ে কাপড়ে মুছে ছেলের কাছে। অথচ স্বয়ং সাধুবাবা স্বীকৃতি দিয়েছেন কত আগে, তার সাধনা আমার থেকে বড়, প্রথম কোলকাতা আগমনে আশ্রম থেকে প্রণাম জানিয়েছেন। আশ্রমে দূর থেকে পায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফুল দিয়ে পূজা করেছেন। আমার নিজের জীবনে তাঁর অলৌকিকত্ব প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেছি, করছি আজও। বারংবার সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি তাঁর কৃপায় আশীর্বাদে অলৌকিকভাবে, অবিশ্বাস্যভাবে তবু সব ছাড়িয়ে সদা সর্বদা মনে পড়ে তাঁর লৌকিক মাতৃস্নেহ। অসুখের সময়ে ঘণ্টা ধরে মাকে বারবার ওষুধ খাওয়াতে হ'ত। মা বিরক্ত হ'য়ে উঠছিলেন ক্রমে ক্রমে। একদিন কিছুতেই খাচ্ছেন না ওষুধ। আমি মন খারাপ করে রুগীর ঘরের বাইরে বেঞ্চে বসে আছি একটু পরে রোগক্লান্ত ক্ষীণস্বরে মা ডাকছেন সুনুরে দেনা কী ওষুধ দিবি দে। আমার সমস্ত অভিমান মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। আজ বার্দ্ধক্যেও দেখেছি—এমন করে আমার দুঃখে সুখে সমব্যথী আরত' কেউ কখনও হয়নি। সমস্ত দৈবী অনুগ্রহ নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত ভুলে যাই, বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখা সত্যিকারের মায়ের উপস্থিতির অনুভবে। আপনাদের কাছে আজ অবশ্যই বলা উচিৎ সেই দৈবী শক্তির অযাচিত কৃপা। সত্যি সত্যি অযাচিত আমি প্রার্থনা করিনি, চাইনি কল্পনাও করিনি, হাতের নাগালে কেমন করে সেধে এসে জুগিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭৭ সালে আমার মেয়ে মিতুর জন্ম। ওর অন্নপ্রাশনে গড়িয়েছিলাম একটা গলার হার। ২০০২ সালে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে অন্য গয়না গড়াব ভাবছি—হাতের সামনে কোন কাগজের ভেতর থেকে আপনি বেরিয়ে এল পঁচিশ বছর আগের গড়ান হারের রশিদ। কোন দোকান, কতটা সোনা, কত দাম সব। সেই দোকানে হার আর রশিদ নিয়ে গিয়ে মেয়ে পছন্দ করল নতুন গয়না—পান-মরা কিছু বাদ গেল না, পুরো সোনাটাই পেলাম। মা গো? তুমি ত' আমার একটি মাত্র মা। আমার আশ্রয়দাতৃ। শুধু পরকালের নয় আমার ইহলোকের কাণ্ডারী। আর তোমার সহস্র কোটি পুত্রকন্যা—তাদের সকলের দেখভাল করেও আমার কিসে এতটুকু সুবিধে তাও তোমাকে নাড়া দেয়। আর আমি দিনান্তেও স্মরণ করি না! তোমার দেবীত্ব ভুলে শুধু মুগ্ধ থাকি মাতৃত্বে! এক দীন ভিখারী রাজপথে ভিক্ষা করতে নেমেছে। সে পথে যাচ্ছেন রাজাধিরাজ বিপুল সমারোহে। কুণ্ঠিত ভিখারী পথপ্রান্তে আড়াল করতে চায় নিজেকে—সেখানেই সমাগম রাজাধিরাজের—ভিখারীর কাছে চাইলেন ভিক্ষা—সঙ্কুচিত ভিখারী একটি তণ্ডুলকণা তুলে দিল হাতে। বাড়ী এসে ভিক্ষার ঝুলিতে দেখে একটি ছোট স্বর্ণকণিকা!—দিলাম যা রাজ ভিখারীরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে, তখন ভাসি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে—তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য ক'রে—তিনি ত' দশহাতে প্রসাদ বিতরণ করতেই এসেছেন। আমার গ্রহণ করার মত দুটি অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে হবে—আর কিচ্ছু নয়।

এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মেখলা দাশগুপ্ত। সুমধুর কণ্ঠে, রবীন্দ্রসঙ্গীতোচিত

যথাযথ গায়কীতে সুনির্বাচিত পরপর চারটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে তিনি সভাকে মহিমান্বিত করে তোলেন। গানগুলি ছিল—"যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ. দিয়েছ তারি পরিচয় / সবারে আমি নমি—" "আমার যে সব দিতে হবে সেত' আমি জানি সব দিতে হবে··" "গরব মম হরেছ প্রভু দিয়েছ বহু লাজ, / কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব বল আজ···" এবং সবশেষে "তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে, / নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে—"। সঙ্গীতগুলি তাঁর কণ্ঠে গীত হ'য়ে অনুরণিত হয়েছিল সভার সকলের হৃদয়ে—তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম নিবেদিত হয়েছিল সভার সকলের—সাধুবাবা, সাধুমার পায়ে।

এরপর ভাষণ দেন সভানেত্রী শ্রীমতী অপর্ণা দাস। তিনি বলেন সাধুমা তাঁদের সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। জন্মাবধি তাঁর সঙ্গে এত ঘনিষ্ট ভাবে ওঠা বসা থাকা খাওয়া শোওয়া হয়েছে যে তাঁকে বিশেষ করে দেবী হিসেবে, ঠাকুর মনে ক'রে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। যখন তাঁর কাছে আসতাম, সাধুমা খুব যত্ন করতেন, আমাদের আবদার বায়না সহ্য করতেন, রোগে সেবা করতেন। মনে করতাম এসব আমাদের স্বাভাবিক পাওনা - বাড়তি কিছু না। আজ বয়স হয়ে গিয়েছে অনেক। এখন বুঝি এ তাঁর দেবী শক্তির অলৌকিক কৃপা, অযাচিত করুণা। এখনও কত অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখি আশ্রমে, এখন তাঁকে দেবী বলে ঠাকুর বলে মনে ভক্তি এসেছে। নিউ আলিপুরের এক ভদ্রলোক চোখের অসুখে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন দেখেন কোনও এক অজানা সাধু তাঁকে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে চোখের চিকিৎসা করাতে বলছেন। হঠাৎই তাঁর আশ্রমে আসা, সাধুবাবার মুর্তি দর্শন আর বিস্মিত হ'য়ে দেখা যে এই সাধুবাবাই তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে এলেন। এখন অনুভব করি তাঁদের শক্তি ঐশ্বর্য, কৃপা, করুণা। এখন বুঝি নিষ্কাম প্রার্থনা অন্য কিছু চাই না বিনা চরণ দুখানি—এই শুধু করে যেতে হবে আমৃত্যু। করুণাময় তিনি করুণা তিনি করবেনই।

এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীমতী শকুন্তলা মুখার্জী। দুর্গানাম কীর্তন শেষে সভা সমাপ্ত হয়।

অনুলেখক—শ্রীমতী সুনন্দা সান্যাল

"আকাশের মত হোক হৃদয় উদার।
সলিলের মত কর সরল বিচার॥
বসুধার মত রহ সহ্যশক্তিমান।
হৃদয়ে ধারণ কর সত্যেরে মহান॥"

—শ্রীতারাচরণ

Spirituality

by

Dr. A. K. Bandyopadhyay

"Spirituality" means "something concerned with or affecting our soul or spirit." It is that of our being which is associated with our minds and feelings as distinguished from our physical bodies. Minds can be conscious or unconscious or sub-conscious. In our sub-conscious mind all our thoughts and acts of the past are stored up in this life or perhaps even our past lives. Minds can be wild and it is necessary for us to control them through the will because uncontrolled and unguided mind will drag us down and down. If we control our minds and guide them they will save us. We can always analyse our minds by themselves. Minds can be turned inward through watchfulness and systematic training and then it can be united with our soul or Atman. When the mind is under control we can attain a consciousness which will enable us to study the mind and control our mind which is revolving around various undesirable ideas and thoughts. To control the mind effectively we must go deep down into the sub-conscious mind. By control of the subconscious mind we shall get control over the conscious mind. Basically, our will and mind are bound by the law of causation and they are within time and space. The degree of vibration brings about distinction between mind and matter. Mind can become matter and matter can also become mind. As regards priority between mind and matter, the analogy of egg and the bird holds good (Sometimes egg came first and sometimes the bird). Man is not only his mind but his soul. Soul is the animating and vital principle in a human being who has the faculties of thought, action and emotion. It is an immaterial entity. Man's soul is ever free, boundless and eternal. The whole process of human evolution is the soul's struggle to manifest itself. Man is combination of body, mind and spirit. Spirit is another name for soul. Soul is the same as spirit. The nature of the soul is that ordinarily it goes after sense-enjoyments and vanities of the world when it lives only in the senses. But when it looks upward and catches a glimpse of God then its whole vision changes. Man is not mind only, he is also a soul which is ever free, boundless and eternal. Soul is always working itself outward through a process called evolution. Evolution is another name for soul's struggle to manifest itself. Man has power of concentration to control the mind. If concentration is lacking then mind would control us. Concentration can be developed and mastery can be obtained over it by practice

of Yoga. Yoga means being united with the Supreme Spirit. In Yoga it is necessary to begin with control of breathing and we should know about "Asana" or posture. We know that mind acts on the body, so does body over mind. There is action and reaction and both body and mind react on each other. By regular systematic control over breathing and then by governing the gross and fine body in turn, "Yoga" joins man with God and different "Yogas" are prescribed for different minds and they are a practical part of religion. Through "Yoga", mind also knows itself. We need to develop spiritually and be great in heart and mind both and then should be great in deed. This needs combination of head, heart and mind. Our souls are a part of God. Soul is by nature omnipotent and omnipresent. Our spiritual goal is to attain freedom (Mukti).

অনন্য লীলা

কবিরত্ন শ্রীসুধীর গুপ্ত

—১— অশেষ পাথারে বিশেষ - বিশেষ
তরঙ্গদের রঙ্গ
মানসে যে হেরে নেহারে নীরবে
অণু - রেণুরাও অঙ্গ,
বাদ কিছু নাই - বাদ কেহ নাই—
তাই যে নানান ভঙ্গ।

—২— নর - নারীরাও সঙ্গী তাহার—
বিলয়ে - উদয়ে তাই
আন্দোলিত যে ললিত লীলায়
হওয়ায় সর্বদাই
বিরহ - মিলন একাকারই হয়—
আলাদা সত্তা নাই।

—৩— পাথার তাহার পরম লীলায়
যে ঊর্মি - রূপ দানে,
তাহাই বহন করিয়া সতত
জোয়ার - ভাটার টানে
মোহানায় যায়, পায় যে লীলায়
উদধিরে সন্ধানে।

—৪— এ লীলার আর শেষ মোটে নাই—
লহর যে অগণিত
যার টানেই সকলেই চলে
হয় না বিলয় - ভীত,
অনুস্যূতেরে এভাবেই লভি'
হয় যে আনন্দিত।

—৫— আলাদা - আলাদা সত্তা যে লভে—
আপেক্ষিক যে সব
ক্ষণিকতা মাঝে অশেষতা রয়
তাই লাগে অভিনব,
ব্যাপ্তি যে পায় এভাবে ধরায়
অতুলন অনুভব।

—৬— ভূমণ্ডলই যে লীলা - মণ্ডল—
ভুবনে জনম - লাভে
সীমিত জীবনে নানান সময়ে
অসীম মাধুরী পাবে,
সাধনায় তায় এই বসুধায়
সুখেই জীবন যাবে।

—৭— নিজের স্বরূপ জানিতে পারিলে
একক রূপ-ই যে হেরে,
ভিন্নতা-বোধ আর তো থাকে না
অজ্ঞতা যায় ছেড়ে
উপলব্ধি যে সত্তায় করে
শাশ্বত এককেরে।

—৮— মানব - জীবন তাই অতুলন
অনন্য সাধনায়
অরূপ - রূপেই অস্থায়ী রূপে
সত্তারই মাঝে পায়,
সমাধিতে তায় যখন - তখন
একাকার হ'য়ে যায়,
জাতক - জীবনে এ লীলাই চলে
জঙ্গম দুনিয়ায়।
কবে লীলা শুরু—কবে লীলা শেষ
সবেই জানিতে চায়,
অজ্ঞেয় যাহা অজ্ঞাত রয়
জিজ্ঞাসা বাড়ে তায়।

এবার ফিরাও মোরে

অঞ্জলি চক্রবর্তী

এবার ফিরাও মোরে আলোকের পথে
হে বিধাতা! সহজ সরল জীবন গড়িতে
চাই নাকো ধন - মান যশখ্যাতি
আকাশচুম্বী দালান আর রাজৈশ্বর্য ইতি
সব করেছি বর্জন; শুধু চাই
জ্ঞান আহরণ, শক্তি সাহস যেন পাই
তব কাছ থেকে, উৎসাহ দিও চিরদিন
করুণা আশিস তব, ঢালো রাতদিন—
আমার মস্তক'পরে, বিচলিত করো না মোরে
শত বিপদ ঝঞ্ঝায়, ঠাঁই যেন পাই তব দোরে
ধৈর্য অটুট রাখো আর মনোবল
আঘাতেও করো নাকো কভু হীনবল

সহনশীল ক্ষমাশীল যেন হতে পারি
দুঃখ দৈন্য ভুলে গিয়ে হাসিয়া বরণ করি
যেন দারিদ্র্যের অভিশাপ, আর ক্ষমার মহত্ব দিয়ে
অন্যায় অসত্য ভুল জয় করে নিয়ে
উর্দ্ধে যেন থাকি সব হীনতা নীচতার
এবার ফিরাও মোরে জ্ঞান আহরণে
ভ্রমি যেন ভূ-কাননে সত্যের সন্ধানে
জ্ঞান সাধনায় যেন মত্ত থাকে মন
সর্বেশ্বরে সেবা আর সাধন ভজন
এই যেন নিত্যকর্ম নির্ধারিত হয় মম
তোমার চরণে প্রভু—এই আকিঞ্চন।

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীমতী যূথিকা সিন্‌হা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি
রাধাকৃষ্ণের দোল
আলো করি এলে প্রভু
শচীমাতার কোল॥
নদীয়ায় জন্ম তব
নদে হোল ধন্য
অবতার রূপে এলে
দেব শ্রীচৈতন্য॥
কত পাপী উদ্ধারিলে
"জগাই, মাধাই"
মহাপাপী দুজনারে
তরালে নিমাই।

হরিনাম বিলাইয়া
নগরে নগরে
উদ্ধার করিলে তুমি
কত অভাগারে।
লক্ষ্মী স্বরূপিনী সতী
তোমার সে জায়া
পতিপরায়ণা সে যে
নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
ঘুমে অচেতন দেখি
বাহিরিলে হায়
হেথা শচীমাতা কাঁদে
পাগলের প্রায়॥

বাহির হইয়া পথে
ডাকিছে "নিমাই"
কত যে ডাকিছে মাতা
কোন সাড়া নাই॥
হেথা বধূমাতা কাঁদে
ভাসি আঁখি নীরে
কোথায় চলিলে প্রভু
রাখিয়া আমারে'॥
চলিলেন মহাপ্রভু
আপনার মনে
সঙ্গী-সাথীদের লয়ে
কত ভক্তজনে॥

'হরিবোল', 'হরিবোল'
গাহিতে গাহিতে
ছুটিয়া চলেন প্রভু
পুলকিত চিতে॥
চলিতে চলিতে পথে
পাইলেন সাথী
নাম তার নিত্যানন্দ
পরানে ভকতি॥
দোল পূর্ণিমার এই
পূণ্য তিথিতে
এসেছিলে তুমি দেব
এই ধরণীতে।
হেথায় আসিয়া গাহি
হরিগুণ গান
কত পাপী উদ্ধারিলে
জাগাইলে প্রাণ।
প্রণমি দোঁহারে প্রভু
শ্রীগৌর নিতাই
মন প্রাণ থাকে যেন
চরণে সদাই॥

শিশুভারতী

এই মানুষই

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

এই মানুষই ছন্দ নিয়ে
শব্দ-মালা গাঁথে,
এই মানুষই দ্বন্দ্ব বাধায়
ভিন্ন মানুষের সাথে।
এই মানুষই হ'ন দেবতা
গুণে এবং জ্ঞানে,
এই মানুষই সমাহিত
বিশ্ব-হিতের ধ্যানে।
এই মানুষই জঙ্গী হয়ে
নেয় মানুষের প্রাণ,
আবার দেখি মন-নদীতে
আনে প্রেমের বান।
এই মানুষই সবার ডাকে
বিশ্বায়নের মেলায়,
এই মানুষই হয় অমানুষ
নিজের অবহেলায়।
মন্দ-ভালোর দো-টানাতে
ভালোর আলোর দিকে—
মানুষকে ঠিক হাঁটতে হবেই,
মন্দ হবে ফিকে।

॥ গল্পে বীরবল ॥

শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত, (সাহিত্যভারতী)

॥ সাবাশ বীরবল ॥

বিপদে পড়লে সবাই ছুটে আসতো বীরবলের কাছে। ধনী, দরিদ্র, ছোট, বড় কোন বাছ-বিচার ছিল না। অর্থাৎ বীরবলই ছিল সবার পরিত্রাতা।

একদিন আকবরের প্রিয় পরিচারকও ছুটে এল বীরবলের কাছে। বীরবলের দু'হাত ধরে বললে—'হুজুর, আমাকে বাঁচান। এই বিপদে একমাত্র আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন।

আগে ব্যাপারটাতো বলুন, তারপর দেখা যাবে। বীরবল বললো।

পরিচারক তখন বলতে লাগলো—

বেশ কিছুদিন আগে সম্রাট আমাকে একটা তোতাপাখী দিয়ে বলেছিলেন—এটা বেশ উঁচুদরের পাখী, বেশ ভালো করে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তবে একটি কথা—'পাখী বেঁচে নেই'—এ কথা যে আমাকে বলবে, তারই গর্দান যাবে।

তারপর? বীরবল প্রশ্ন করে।

আমি পাখীটাকে বিশেষ যত্ন সহকারে লালন-পালন করছিলুম কিন্তু বাঁচাতে পারলুম না।

ও এই ব্যাপার। কোন ভাবনা নেই। সম্রাটকে খবরটা আমিই জানাবো। বীরবল বললো।

আপনি আমার জন্য নিজেকে বলি দেবেন? না, না, তা হয় না। পরিচারক কাতর কণ্ঠে বললো।

তোমার কোন ভয় নেই। খবর এমন ভাবে দেবো যাতে আমার গর্দানও যাবে না অথচ সম্রাট খবরও জানবেন। বীরবল পরিচারককে আশ্বস্ত করে।

পরদিবস যথাসময়ে বীরবল দরবারে এসে সম্রাটের পাশে বসে নানা কথাবার্তার ফাঁকে বললে-জাঁহাপনা, কিছুদিন আগে আপনি আপনার পরিচারককে একটা পাখী দিয়েছিলেন।

তাতো দিয়েছিলাম। বুঝলে বীরবল, পাখীটা খুব উঁচুদরের। সম্রাট বললেন।

শুধু তাই নয়, পুণ্যাত্মাও বটে। বীরবল বলে। তোমার কথাগুলোই অদ্ভুত। পাখী আবার পুণ্যাত্মা হয় নাকি! সম্রাট উচ্চরবে হেসে উঠলেন।

না হুজুর, হাসবেন না। আমি পাখীটা নিজেই দেখে এসেছি। দেখলাম, ও ধ্যান করছে।

ধ্যান করছে! বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

হ্যাঁ হুজুর। চোখ বুজে আকাশের পানে তাকিয়ে।

বল কি! তাহলে আমাকে তো একবার দেখতে যেতে হয়। আকবর বললেন।

দরবার শেষ হওয়ার পর বাদশা বীরবলকে নিয়ে পাখী দেখতে রওনা হলেন।

পাখীর অবস্থা দেখেই আকবর বুঝলেন, পাখীটা মারা গেছে। তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে বীরবলকে বললেন—বীরবল, তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতে পার, তাই বলে সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে। তুমি ভালোভাবেই জানতে পাখীটা মারা গেছে।

অবশ্যই জানতাম কিন্তু মুণ্ডুটা খোয়াতে চাইনি। বীরবল শান্ত কণ্ঠে বললো।

পরিচারককে কি কথা বলেছিলেন বাদশার মনে পড়লো।

তিনি বিশেষ খুশী হয়ে বীরবলকে বললেন,—এ জন্যই তোমাকে এত ভালোবাসি। তুমি আর একজনের মাথা বাঁচিয়ে দিয়েছ। সাবাশ, বীরবল সাবাশ!

আনন্দ সংবাদ

স্বর্গীয় অতুল কুমার দাশগুপ্ত ও রমলা দাশগুপ্তের একমাত্র প্রপৌত্রী এবং ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী সুস্মিতা দাশগুপ্তের একমাত্র কন্যা. আমেরিকার পিট্‌সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত বেদজ্ঞ। গত বছর (২০০৮) Human Genetics-এ Ph.D, ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁহার কৃতিত্বে আমরা আনন্দিত। শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের নিকট তাহার উত্তরোত্তর কৃতিত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা জানাই।

হারানো সাথী

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পনম ভক্ত ক্ষণপ্রভা গুহ বিগত ৭ই নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ক্ষণপ্রভা অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার ধূমের জমিদার রায় চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছোটবেলায় চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত রায় চৌধুরীদের বিশাল অট্টালিকায় যখন শ্রীশ্রীসাধুমা কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন তখন মায়ের সান্নিধ্য এবং স্নেহ মমতা লাভের বিরল সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কলিকাতায় আসিবার পর মধ্য বয়স হইতে তিনি সদা সর্বদা শ্রীশ্রীসাধুমায়েয় তথা আশ্রমের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীসাধুমারের সহিত কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীসাধুবাবার উৎসবে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত বিভিন্ন তীর্থস্থানে গমন করিয়াছেন। তাঁহার শেষ সময়ে সেবা শুশ্রূষা করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসাধুবাবার আশীর্বাদ স্বরূপ ১৩০২ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে "সজ্বসেবিকা" উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়।

স্পষ্ট বক্তা, সর্ব কর্মনিপুণা, স্নেহ ও মমতাময়ী ক্ষণপ্রভার পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

মঠের সংবাদ

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের আনুষ্ঠানিক পূজা :—বিগত ২১শে ডিসেম্বর, ২০০৮ রবিবার, ২০ নং রিজেন্ট এষ্টেট, যাদবপুর, শ্রীযুক্ত সুনির্মল সরকার এবং শ্রীমতী মায়া সরকারের গৃহে শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের আনুষ্ঠানিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজারী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে সমগ্র গৃহ প্রাঙ্গণ আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠে। পূজা, পাঠ, আরাত্রিক, হোম, সঙ্গীত, আলোচনা এবং দুর্গানাম কীর্তন সমাপনান্তে উপাদেয় প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

মুম্বই সত্যসঙ্ঘ—বিগত ২৫শে জানুয়ারী, ২০০৯ রবিবার 305 Rainbow, রাহেজা বিহার, মুম্বই-৭২ শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য ও শ্রীমতী স্বপ্না মুখোপাধ্যায়ের গৃহে বেলা সাড়ে এগারোটায় শ্রীশ্রীসাধুবাবার স্মরণোৎসবের আকারে মুম্বই সত্যসঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের সুসজ্জিত পুষ্পমাল্য শোভিত প্রতিকৃতির সম্মুখে সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে দ্বৈতকণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে কুমারী সুচরিতা দত্তগুপ্ত ও শ্রীমান সুহৃৎ দত্তগুপ্ত—"জগত জুড়ে উদার সুরে।" এরপর সমবেত সবাই গুরুবন্দনা—"ভবসাগর তারণ কারণ হে"—সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। তাহার পর শ্রীশ্রীসাধুবাবার জীবনী সম্বন্ধে বহু জানা-অজানা তথ্য ভরা স্মৃতিচারণ করেন শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ। অন্যান্য ভক্তরাও এই স্মৃতিচারণায় যোগদান করেন। তাহার পর সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন শ্রীমতী উর্মিমালা রায়চৌধুরী—"অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।" সঙ্গীতের পর শ্রীশ্রীসাধুবাবার বাণী পাঠ করেন শ্রীমতী মৌলী দাশগুপ্ত। বাণী পাঠের পর শ্রীঅর্কব্রূপ বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত কণ্ঠে—"এই করেছ ভাল নিঠুর" গানটি পরিবেশন করেন। সঙ্গীতের পর শ্রীশ্রীসাধুবাবা বিষয়ক লেখা পাঠ করেন শ্রীযুক্ত অরিজিৎ চৌধুরী ও বিক্রমজিৎ সেন। শ্রীযুক্ত সেন-এর কন্যা মল্লিকা এর পর রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন—"কেন তোমরা আমায় ডাকো।" সঙ্গীতের পর শ্রীমতী স্বপ্না মুখোপাধ্যায় আমন্ত্রিত প্রত্যেক ভক্তকে সাধুবাবার জীবনী ও বাণী বিষয়ক বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করেন। সবশেষে সমবেত কণ্ঠে দুর্গানাম কীর্তনের সহিত সেদিনকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়। দুর্গানাম কীর্তন পরিচালনা করেন শ্রীমতী উর্মিমালা রায় চৌধুরী। সভাশেষে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মুম্বই সত্যসঙ্ঘের তৃতীয় অধিবেশন শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ ও শর্বরী সেন-এর গৃহে আয়োজিত হবে এই সিদ্ধান্ত হয়। ঠিকানা—702 Seahill ; 31/32 Union Park Khar (West) ; Mumbai—400052। তারিখ—26 April 2009। সময়—11 am। শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ সেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন-এর পৌত্র।

—ডঃ সিদ্ধার্থ দত্তগুপ্ত

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি পূজা ঃ—কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সোমবার শ্রীশ্রীশিবরাত্রি পূজা উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত শ্রীতারামঠে আগমন করেন। দিন ও রাত্রিতে যথাবিহিত পূজাদি সম্পন্ন হয়।

রবিবাসরীয় সভা ঃ—

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৮ সালের আগষ্ট মাসে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ৩, ১০, ১৭, ২৪ ও ৩১ তারিখে।

৩-৮-২০০৮ ঃ বিষয়—"শরণাগতি"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত ও শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১০-৮-২০০৮ ঃ বিষয়—"রাসলীলা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত ও শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১৭-৮-২০০৮ ঃ বিষয়—"সহিষ্ণুতা"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী। সভাপতির ভাষণ। স্মরণ সভা—অজিত কুমার ভদ্র। সঙ্গীত—জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্তী। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ—ডঃ সুনন্দা সান্যাল, শ্রীসুবোধ ঘোষ, শ্রীরণজিৎ কুমার ভদ্র, শ্রীমতী বৈজয়ন্তী রায় ও শ্রীমতী মীরা ধর। শোক প্রস্তাব পাঠ ও গ্রহণ। ১ মিনিট নীরবতা পালন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২৪-৮-২০০৮ ঃ বিষয়—"শ্রীশ্রীসাধুমা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীসুনীল রাহা। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

৩১-৮-২০০৮ ঃ বিষয়—"শ্রীশ্রীসাধুমা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী মাধুরীসুধা চৌধুরী, ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত ও শ্রীউত্তম অধিকারী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন।

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তারিখে।

৭-৯-২০০৮ ঃ বিষয়—"ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র"। সভাপতি—শ্রীরামানন্দ সেন। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী মাধুরী সুধা চৌধুরী, শ্রীঅর্দ্ধেন্দু দাশগুপ্ত, ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত ও

শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত রবি রায়। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১৪-৯-২০০৮ : বিষয়—"নিজের দোষ নিজে দেখিও"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত, অর্দ্ধেন্দু দাশগুপ্ত, শ্রীমতী মেখলা দাশগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ সেন ও শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২১-৯-২০০৮ : বিষয়—"দুর্গাপুজার আবশ্যকতা"। সভাপতি- ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত, শ্রীউত্তম অধিকারী, শ্রীবিশ্বনাথ সেন ও শ্রীমতী মেখলা দাশগুপ্ত। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন--শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২৮-৯-২০০৮ : বিষয়—"মহালয়া"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত, শ্রীউত্তম অধিকারী ও ডঃ অনিরুদ্ধ সিন্‌হা। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ৫, ১২ ও ২৬ তারিখে। ১৯শে অক্টোবর শ্রীশ্রীসাধুমায়ের জন্মোৎসবের জন্য রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় নাই।

৫-১০-২০০৮ : বিষয়—"সত্যই পথ"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী ও শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১২-১০-২০০৮ : বিষয়—"মনের মিলন"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২৬-১০-২০০৮ : বিষয়—"শ্রীশ্রীসাধুমা"। সভাপতি—শ্রীমতী অনসূয়া রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীসলিল ভট্টাচার্য্য। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

সাধুবাবা শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের

ও

সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর

শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য—

ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সরসীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতিতে

নিবেদিত

নিবেদক

নয়াদিল্লী সত্যসঙ্ঘ

দূরভাষ :—

২৬৩৪৯৯৮৯, ৯৮১০১২৪৮৪১, ৯৮৯১৭২২৯১১, ৯৮১১০৯০৬৮৭

"ব্রহ্মচর্য্য সত্যনিষ্ঠা আছয়ে যাহার।
সাধনার প্রয়োজন নাহিক তাহার॥"

—শ্রীতারাচরণ

15th MARCH—2009 REGISTERED SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-190/2007-09

সত্যসাথী ফাল্গুন ১৪১৫ R. N. I. No. 2677/57

ভাবসিন্ধু ৺নির্ম্মল চন্দ্র বড়ুয়া রচিত—

১।	সাধনার আলো (২য় সংস্করণ)	১০ টাকা
২।	শ্রীশ্রীমা অরণ্যকুমারী (২য় সংস্করণ)	১০ টাকা
৩।	অমৃত পরশ	৫ টাকা
৪।	স্মরণ	৪ টাকা
৫।	শ্রীপদ ছায়ায়	২০ টাকা
৬।	প্রাণের ঠাকুর	২২ টাকা
৭।	চিরসাথী হে অমৃতময়	১২ টাকা
৮।	শ্রীশ্রীতারাচরণ কাব্যসম্ভার (আদি পর্ব)	১০ টাকা
৯।	ঐ (মধ্য পর্ব)	১৬ টাকা
১০।	স্মৃতির আলোয় সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী	২০ টাকা
১১।	The Message of Sri Sri Sadhubaba Taracharan Paramahansa	১ টাকা
১২।	অমোঘ আহ্বান	৫ টাকা

শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

R. R. BANERJEA, B.Sc.

Sri Sri Sadhu Taracharan Paramahansadev— Rs. 10.00

প্রেমনিধি ৺উপেন্দ্রনাথ ঘটক রচিত—

শ্রীশ্রীমাতাজীর তীর্থ ভ্রমণ ৫.০০

৺অনিলবরণ চৌধুরী রচিত—

১।	সাধুবাবা শ্রীতারাচরণ পরমহংস (৩য় সং)	১৫.০০
২।	সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী	৫.০০
৩।	শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (গীতি আলেখ্য)	২.০০
৪।	তুষার-তীর্থে (২য় সং)	১০.০০

৺[illegible]রেন্দ্র নাথ ঘটক রচিত—

অমৃত লহরী (১ম খণ্ড) ৪.০০

ঐ (২য় খণ্ড) ৩.৫০

ব্রহ্মানন্দ ৺ব্রহ্মনাথ সুর রচিত—

দেব-সন্নিধানে (২য় সং) ১৫.০০

৺ব্রজেন্দ্র লাল কানুনগো প্রণীত—

সাধু তারাচরণ (২য় সং) ৫.০০

৺যামিনীকান্ত সেন প্রণীত—

সদ্গীতা (২য় সংস্করণ) ৫.০০

৺শচীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত—

সাধুবাবা শ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী (দ্বিতীয় সং) ২.০০

৺কমলা দেবী বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—

রত্নাবলী (২য় সংস্করণ) ১০.০০

শ্রীসুনীল রাহা রচিত—

সবার মা সাধুমা ১০.০০

Late DR. DINESH CHANDRA SEN, D.Sc., P.R.S.

Sadhubaba Sri Sri Taracharan Paramhansadev & Sadhuma Sri Sri Aranya Kumari Devi— Voluntary Donation Rs. 8/-

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (হিন্দী)—শ্রীজয়দেব নারায়ণ সাহী মূল্য—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীতারামঠ, ৬এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তারাচরণ সত্যসঙ্ঘের পক্ষে 'সত্যসাথী মুদ্রণ', ৬বি, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যসাথী কার্য্যালয় : ৬এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ Tel. No. 2464-2099

Mob : No. 9748955894